হিন্দুসংস্কারক গ্রন্থমালা — সং ২

দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত।

[উল্লিখিত ও লিখিত]



শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত।



শ্রীশিশিরকুমার ঘোষাল এম্, এ, বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



কলিকাতা।

বঙ্গাব্দ, ১৩১৫।

মূল্য চারি আনা

২৮ নং বইটকখানা রোড, কলিকাতা—বকুলও প্রেসে
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



বিজ্ঞাপন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর একখানি সম্পূর্ণ সুবৃহৎ ও সমালোচনা-সম্বলিত জীবনচরিত বঙ্গীয় পাঠক-সাধারণের সমীপে উপস্থিত করিবার সংকল্পে, আজি কএক বৎসর ধরিয়া যে সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি, এ কথা সকলে না জানিলেও বোধ হয় অনেকেই জানেন। সেই প্রস্তাবিত জীবনবৃত্ত প্রকাশিত করিবার পক্ষে, উহার উপাদান-সংগ্রহাদি যাহা কিছু কার্য্য সমস্তই একরূপ সমাপ্ত। এক্ষণে সেগুলি একত্র ও লিপিবদ্ধ করিয়া, এবং পরিশেষে ছাপাইয়া পুস্তক বাহির করিলেই হইল। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে—অন্য কর্তৃক স্বামিজীর জীবনবৃত্ত বিবরিত হইবার অগ্রে, স্বামিজী নিজের সম্বন্ধে নিজে যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রচারিত করাই কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নহে? ফলতঃ এই কারণেই দয়ানন্দের উল্লিখিত ও লিখিত জীবনবৃত্ত দুইটি সঙ্কলিত ও সম্পাদিত করিয়া দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। ইতি

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ,
কলিকাতা।

শ্রীদে——

উল্লিখিত ।

দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত।

১

[পুনার সভায় উল্লিখিত।]*

আমি ব্রাহ্মণ কি না? এই কথা অনেক লোকেই জিজ্ঞাসা করেন, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ কোন পরিচিত ব্যক্তির নাম-নির্দ্দেশ করিতে, কিংবা কোন আত্মীয়বন্ধুর পত্র উপস্থাপিত করিতে তাঁহারা আমাকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, গুজরাটবাসী লোকদিগের সঙ্গেই আমার প্রীতির সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত অধিক। এইক্ষণে যদি কোন আত্মীয়বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা হইলে সংসারের যে অশান্তি-জাল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি, আমাকে

* ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে পুনার একটি সাধারণ সভায় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক উক্ত বৃত্তান্তটি বর্ণিত হইয়াছিল। পুনাতে মাসাধিক কালব্যাপী ব্যাখ্যানের পর, তথাকার কএকটি শিক্ষিত এবং উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির সবিশেষ অনুরোধেই স্বামিজী স্বীয় জীবনের কথঞ্চিৎ ইতিহাস উল্লিখিত বৃত্তান্তটিতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। উহা প্রথমে বক্তৃতার আকারে হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে মারহাট্টিতে অনুবাদিত হইয়া পুনার জ্ঞানপ্রকাশ পত্রে বাহির হইয়াছিল। তৎপশ্চাৎ মারহাট্টি হইতে ইংরাজিতে অনুবাদিত করিয়া লাহোরস্থ আর্য্য-পত্রিকার প্রথম খণ্ডে ৪৬।৪৭।৪৮ সংখ্যায় ধারাবাহিক রূপে মুদ্রিত করা হইয়াছিল। উপস্থিত প্রবন্ধটি উল্লিখিত ইংরাজি অনুবাদেরই অনুবাদ-মাত্র। অনুবাদকার্য্যে ভাষারক্ষা অপেক্ষা ভাবরক্ষার দিকেই অধিকতর যত্ন করা হইয়াছে। সম্পাদক।

নিশ্চয়ই পুনর্ব্বার সেই অশান্তি-জালে জড়িত হইতে হইবে। তন্নিমিত্ত কোন আত্মীয়-কুটুম্বের নামোল্লেখ করিয়া, অথবা তাঁহাদিগের কাহারও কোন পত্র উপস্থাপিত করিয়া আমি কোন অংশেই আপনার ক্লেশের কারণ হইতে চাহি না।

মর্ব্বি আমার জন্মস্থান। উহা একটি নগর, এবং গুজরাটের অন্তর্গত ধ্রাঙ্গাধ্রা রাজ্যের * সীমান্তস্থিত। উদীচ্য † ব্রাহ্মণ-

* ধ্রাঙ্গাধ্রা-রাজ্য গুজরাটের অন্তর্গত নহে—কাঠিবারের অন্তর্গত। সং

† উদীচ্যের অর্থ উত্তরদেশীয়। গুজরাটের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় যে মুলরাজ সোলাঙ্কি অনহলবারায় একজন রাজা ছিলেন। তিনি মাতৃপক্ষীয় কোন আত্মীয়-বধের নিমিত্ত চিত্তে একান্ত অনুতপ্ত হইয়া রাজকীয় সমস্ত কার্য্যাদিই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের অভিপ্রায়ে তীর্থ-পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু তীর্থ-পরিভ্রমণাদির দ্বারাও যখন চিত্তে শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, তখন উত্তর দেশ হইতে এক সহস্র শুদ্ধচরিত্র ও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে ভূম্যাদি সম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিলেন। তদনুসারে গান্ধার দেশ হইতে একশত, কাণ্যকুব্জ হইতে দুই শত, কুরুক্ষেত্র হইতে দুই শত বায়াত্তর, নৈমিষারণ্য হইতে একশত, এবং এইরূপে অন্যান্য স্থান হইতেও ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ব্রাহ্মণমণ্ডলী আহূত করিয়া অনহলবারা নগরে সর্ব্বসমেত এক সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র করিলেন। সেই সম্মিলিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কাহাকে ভূমি, কাহাকে গ্রাম, কাহাকেও বা অপর কিছু সম্পত্তি অর্পিত করিয়া রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে তাঁহাদিগকে বাস করাইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ বা ইহাঁদিগের বংশধরেরাই এক্ষণে গুজরাট ও কাঠিবার প্রদেশে উদীচ্য বা "উদীচ্যসহস্র" নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় ৯৯৭ অব্দে মুলরাজের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং তৎকর্ত্তৃক এই ব্রাহ্মণানয়ন ও ব্রাহ্মণ-সংস্থাপনরূপ সুমহৎ কার্য্য খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বা তাহার কিছু পরেই সংঘটিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। Rasmala, P. 48, by A. K. Forbes Published in 1878, New Edition. সং

কুলে আমার জন্ম। উদীচ্য ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ সামবেদী হইলেও আমি শুক্ল যজুর্ব্বেদে শিক্ষিত হইয়াছিলাম। আমাদিগের পরিবার একটি বিস্তৃত জমিন্দারীর অধিকারী ছিল। আমার বয়ঃক্রম এক্ষণে ঊনপঞ্চাশ কিংবা পঞ্চাশ। আট বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে আমার একটি সহোদরা ছিল। আমার একজন জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। আমি জ্যেষ্ঠতাতের একান্ত স্নেহপাত্র ছিলাম। আমাদিগের সংসার এক্ষণে পনরটি ভাগে বিভক্ত।

বাল্যে রুদ্রাধ্যায় অভ্যাসপূর্ব্বক যজুর্ব্বেদ পড়িতে আরম্ভ করি। পিতা একজন ঘোরতর শৈব ছিলেন বলিয়া আমাকেও শিবোপাসনায় উপদিষ্ট করিলেন। তদনুসারে দশম বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই পার্থিব-পূজন * শিক্ষা করি। এতদ্ভিন্ন শিবরাত্রির ব্রতাবলম্বন করিবার জন্যও পিতা একদা আদেশ করিলেন। আমি সে আদেশ-পালনে অসম্মতি প্রকাশ করিলেও, আমাকে বাধ্য হইয়া শিবরাত্রির ব্রতকথা শুনিতে হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহা শুনিতে শুনিতে আমার নিকট এতদূর প্রীতি-দায়ক হইয়া উঠিল যে, জননীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি শিব-ব্রতাবলম্বনে সংকল্পারূঢ় হইলাম। সংকল্পারূঢ় হইয়া ব্রতগ্রহণ করিলেও কিন্তু ব্রতপরিসমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

---

* মৃত্তিকা-গঠিত শিবলিঙ্গের নাম পার্থিব-লিঙ্গ, এবং সেই লিঙ্গপূজনের নামই পার্থিবলিঙ্গ-পূজন বা পার্থিব-পূজন। সং

আমাদিগের সহরের বাহিরে যে বৃহৎ শিবালয় ছিল, তথায় শিবচতুর্দ্দশীর দিন বহুতর লোকের সমাগম হইত। আমিও একবার ব্রতধারী হইয়া শিবচতুর্দ্দশীর দিন সায়ংকালে সেই শিবালয়ে পিতার সহিত যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মহাদেবের প্রথম এবং দ্বিতীয় পূজা পরিসমাপ্তির পর যখন মধ্যরাত্রির আবির্ভাব হইল, তখন মন্দিরাগত লোকদিগের সকলেই একে একে নিদ্রাগত হইয়া পড়িতে লাগিল। এই অবসরে পূজারিগণ মন্দির হইতে চলিয়া গেলেন। পিতৃদেবও নিদ্রাগত হইয়া পড়িলেন। পাছে, ব্রতভঙ্গ করিলে প্রার্থিত ফল-লাভে বঞ্চিত হই, এই ভয়ে কিছুতেই নিদ্রাপন্ন হইতে পারিলাম না। মন্দিরের মধ্যে এইরূপে একাকী হইয়া জাগিয়া রহিয়াছি, এমত সময়ে একটি ঘটনা উপস্থিত হইল। কএকটা মূষিক বাহিরে আসিয়া মহাদেবের গাত্রোপরি দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল, এবং মাঝে মাঝে মহাদেবের মস্তকার্পিত চাউলগুলি ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমি জাগরিত থাকিয়া মূষিকদিগের এবম্বিধ ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে মনে হইল,—একি! যে মহাদেবের শান্ত পবিত্র মূর্ত্তির কথা, যে মহাদেবের প্রচণ্ড পাশুপতাস্ত্রের কথা, এবং যে মহাদেবের বিশাল বৃষারোহণের কথা, গত দিবস ব্রত-বৃত্তান্তে অবগত হইয়াছি; সেই মহাদেব কি বস্তুতঃ ইনিই? এ প্রকার চিন্তায় বিচলিত-চিত্ত হইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম যে ইনিই যদি সেই প্রবল প্রতাপী

—সেই দোর্দ্দণ্ড দৈত্যদলনকারী মহাদেব যথার্থই হয়েন, তাহা হইলে স্বীয় শরীর হইতে সামান্য কএকটা মূষিককেও বিতাড়িত করিতে পারিতেছেন না কেন? এইরূপ চিন্তা-স্রোত বহুক্ষণ ধরিয়া আমার মস্তিষ্ককে বিলোড়িত করিতে লাগিল। পরিশেষে মূষিকদিগকে তাড়াইবার জন্য পিতাকে জাগাইলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যে মহাদেব প্রবল পরাক্রমী বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কএকটা মূষিককেও তিনি তাড়াইতে সমর্থ হইলেন না, ইহা কিরূপ? তদুত্তরে পিতা বলিলেন:— "নির্ব্বোধ বালক! ইনি যে সেই মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি-মাত্র।" তাহা শুনিয়া সেই স্থলে এবং সেই ক্ষণেই স্থির করিলাম যে, যতদিন না ত্রিশূলধারী যথার্থ মহাদেবকে দেখিব, ততদিন কিছুতেই তাঁহার পূজা করিব না।

এইরূপে স্থিরচিত্ত হইয়া গৃহে ফিরিলাম। যার পর নাই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম বলিয়া মাতার নিকটে আহারীয় দ্রব্য চাহিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া মাতা বলিলেন:— "তোমাকে ত ব্রত লইতে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম। কারণ আমি জানিতাম যে উপবাস-জনিত কঠোর ক্লেশ তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি ত নিজেই জিদ্ করিয়া ব্রতধারী হইয়াছিলে।" এই বলিয়া তিনি আহারীয় দ্রব্যাদি আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন; এবং যাহাতে আমি আপাততঃ দুই দিবস কাল পিতৃসমীপে না যাই, এবং তৎসমক্ষে একটি কথাও না বলি, তদ্বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন;

যেহেতু ব্রতভঙ্গ-জনিত অপরাধের জন্য পিতা যে আমাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিবেন, এই ধারণায় মাতা নিঃসন্দেহচিত্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক আহারাদির পর আমি শয্যায় গিয়া শয়ন করিলাম, এবং পর দিবস প্রাতে আটটা পর্য্যন্ত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিলাম। আমার পাঠ্য বিষয়গুলি প্রভূত থাকাতে, আর সেই প্রভূত বিষয়গুলি অভ্যাসের পক্ষে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা হওয়াতেই যে আমি শিবব্রত ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছি, পিতামহকে এই কথা বুঝাইয়া বলায়, পিতামহ পিতৃদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আমার বুঝান কথাগুলি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার কোপ-শান্তি করিলেন। তখন আমি যজুর্ব্বেদ পড়িতেছিলাম, এবং জনৈক পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণশিক্ষাও করিতেছিলাম। নয় কি দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে যখন যজুর্ব্বেদের পাঠ সমাপ্ত হইল, তখন পাঠকার্য্য পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, আমাদিগের জমিন্দারীর অন্তর্গত গ্রামবিশেষে পিতা আমাকে প্রেরণ করিলেন।

কোন ঘটনা উপলক্ষে আমাদিগের বাড়ীতে একবার নৃত্যগীত হইতেছিল। সে সময়ে আমার একটি ভগিনী গুরুতররূপে পীড়িতা হইয়া উঠে। পীড়ার প্রকোপে তাহার বাক্‌রোধ পর্য্যন্তও ঘটিল। আমি মুমূর্ষু ভগিনীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলাম। ইহার পূর্ব্বে আমি কখন কাহারও মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখি নাই। সহোদরার মৃত্যু-দর্শনে

চিত্তে যার পর নাই ক্লিষ্ট হইলাম, এবং এইরূপে যে মনুষ্য-মাত্রকেই মরিতে হইবে, তাহাও উজ্জ্বলরূপে বুঝিতে পারিলাম। সেই ঘরের মধ্যে যত লোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেবল আমারই চক্ষু হইতে বিন্দুমাত্রও বারিপাত হইল না। কারণ মৃত্যুর উৎকট ভীতি আমার হৃদয়কে তখন সর্ব্বতোভাবেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। যাহা হউক আমার প্রকৃত অবস্থা না বুঝিয়া, পিতা আমাকে পাষাণ-হৃদয় বলিতে লাগিলেন, এবং সবিশেষ স্নেহের পাত্র থাকিলেও, মাতাও আমাকে পাষাণ-হৃদয় বলিয়া আখ্যাত করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইলেন না। আমি শয্যায় গিয়া শুইবার জন্য আদিষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রাগত হইতে পারিলাম না। কারণ মনোমধ্যে কেবল মৃত্যু-চিন্তাই উদিত হইতে লাগিল—মৃত্যু-বিভীষিকা বারংবার বিচলিত করিয়া তুলিল। বলিতে কি, এরূপ ভয়াবহ দৃশ্য যদি ও আমার সমক্ষে পাঁচ ছয় বার-মাত্র ঘটিয়াছিল, এবং অস্মদ্দেশীয় অদ্ভুত রীতি* অনুসারে যদিও আত্মীয়স্বজনগণ

* কাঠিবার-গুজরাট প্রদেশে শোকপ্রকাশের প্রথা কিছু অদ্ভুত। মৃত্যুর পরে জ্ঞাতি-কুটুম্ব-সংস্পৃষ্ট প্রায় সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ শোকোচ্ছ্বাস ও মর্ম্মবেদনা প্রকাশের জন্য মৃতের বাড়ীতে একত্র হয়। উপস্থিত স্ত্রীলোকগণ একটু পৃথক্‌ভাবে দলবদ্ধ হইয়া, কখন বা মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া চক্ষুতে অশ্রু, মুখে বিলাপ এবং বক্ষে পুনঃপুনঃ করযুগাঘাত সহকারে শোক করিতে থাকে। এইরূপে শোককারিণী রমণীর দল কখন শবের অনুগমন করে, কদাচিৎ মৃত ব্যক্তির গৃহদ্বারে বা গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বিলাপ এবং বক্ষে করাঘাত-জনিত চটাপট্ শব্দে চতুর্দ্দিক শব্দিত করিয়া তুলে। এরূপও শুনা যায় যে শোককারিণীদিগের

তজ্জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি আমি একবারও কি বিলাপ কি রোদন কিছুই করি নাই। এই নিমিত্ত আত্মীয়বন্ধুগণ প্রায়ই আমার নিন্দা করিতেন। যখন নবম বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলাম, তখন পিতামহ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পিতামহ আমাকে সাতিশয় ভালবাসিতেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তখন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলাম, এবং দেখিলাম যে একদিকে লোকে তাঁহার হাত ধরিয়া নাড়ী-পরীক্ষা করিতেছে, অপর দিকে তিনি আমার মুখের দিকে অনিমিষনয়নে তাকাইয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। পিতামহের বিয়োগে হৃদয়ে যেমন ব্যথা পাইলাম, চক্ষু দুটিকেও তেমনই অশ্রু-জলে ভাসাইলাম। অধিকন্তু আমিও যে একদিন এইরূপে মৃত্যু-মুখে পতিত হইব, এই চিন্তাটিও, সেই ক্ষণ হইতেই চিত্তকে বিশেষ করিয়া অধিকার করিল। মৃত্যুভীতি যখনই প্রবলতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইত, আমি তখনই বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট যাইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিতাম। আমার কথা শুনিয়া পণ্ডিতেরা যোগাভ্যাসের পরামর্শ দিতেন। তন্নিমিত্ত সংসার-ত্যাগের ইচ্ছা করিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে।

সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য, মৃত জনের আত্মীয়েরা সময়ে সময়ে শোকপ্রকাশ-নিপুণা নারীদিগকে ভাড়া করিয়াও লইয়া আসেন। সং

পিতা আমার মানসিক অশান্তির কথা বুঝিতে পারিয়া, বোধ হয় তাহা বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়েই, আমাকে জমিন্দারী কার্য্যের ভারার্পণ করিতে চাহিলেন। আমি সে ভার লইতে সম্মত হইলাম না। তখন পাছে আমি বিপথ-গামী হইয়া যাই, এই ভয়ে পিতা আমার বিবাহ দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। এদিকে বিবাহের কথা যখনই উঠিত, আমি তখনই বলিতাম যে বিবাহ কিছুতেই করিব না। আত্মীয়স্বজনগণ এরূপ সঙ্কল্পের অনুমোদন করিতেন না। বিবাহের জন্য যখনই বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইতাম, বিবাহের পরিবর্ত্তে তখনই বন্ধুমিত্রদিগের নিকট গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার অনুমতি চাহিতাম। ফলতঃ দেখিতে দেখিতে এদিকে বিবাহোপযোগী সমস্ত আয়োজন এক মাসের মধ্যেই হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয় বিবেচনা করিলাম। জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি বলিয়া এক দিবস সায়ংকালে মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলাম, এবং তদ্দণ্ডেই সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া গৃহের বাহির হইলাম।

রাত্রিকালটা একটা ক্ষুদ্র পল্লিতে কাটাইয়া খুব প্রত্যূষে উঠিলাম, এবং চলিতে চলিতে খানিক পরে মারোটির * মন্দিরে

* মারোটি কোন গ্রামের নাম হইতে পারে, অথবা কোন হনুমান মন্দিরও হইতে পারে। কারণ কাঠিবার অঞ্চলে হনুমানের মন্দির মারুতির বা মারোটির মন্দির বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। হনুমান পবন-পুত্র বলিয়া হনুমানের অপর একটি নাম যে মারুতি, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সং

পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ শ্রান্তিলাভ করিলাম। এইরূপ * চলাতে আমাকে দশ ক্রোশ পথ কম হাঁটিতে হইল। তথা হইতে শৈলা যোগীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। কিন্তু তাঁহার নিকটে যাওয়া বৃথা হইল। কারণ যোগ-শিক্ষা সম্পর্কে তিনি আমার কিছুই সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলেন না। অতঃপর আমি লালা ভকতের † নিকট গমন করিলাম। লালা ভকৎ একজন যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পথিমধ্যে একজন বৈরাগীর সঙ্গে দেখা হইল। বৈরাগীটির সঙ্গে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি ছিল। বৈরাগীটি আমাকে স্বর্ণালঙ্কারধারী দেখিয়া বলিলেন—"তোমার মত লোকের পক্ষে যোগাভ্যাস অসম্ভব।" তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে আমার স্বর্ণাঙ্গুরীয়গুলি তাঁহাকে প্রদান করি। আমি বৈরাগীর ইচ্ছা-পূরণে তদ্দণ্ডেই উদ্যত হইলাম, এবং স্বর্ণাঙ্গুরীয়গুলির সমস্তই খুলিয়া তাঁহার দেবমূর্ত্তিদিগকে অর্পণ করিলাম। শৈলায়

* "এইরূপ চলাতে" ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে লোকে সাধারণতঃ যে পথে যাতায়াত করে, গৃহ-নিষ্ক্রান্ত দয়ানন্দ সে পথ ধরিয়া চলেন নাই। কারণ তাঁহার আশঙ্কা যে পাছে পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। সং

† লালা ভকৎ আর শৈলা যোগী একই ব্যক্তি। কিন্তু স্বামিজীর উল্লিখিত বর্ণনানুসারে শৈলা যোগী আর লালা ভকৎ দুইটিকে দুই জন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। লালা ভকৎ শৈলা নগরের অধিবাসী ছিলেন। এই হেতু তিনি শৈলা যোগী বা শৈলা ভকৎ বলিয়া কাঠিবারবাসী লোকদিগের নিকট প্রসিদ্ধ। পাঠক! বোধ হয় জানেন যে উক্ত জীবন-বৃত্তান্তটি স্বামিজী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, অপরে শুনিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া নানা পত্রে উহা বাহির হইয়াছে। সুতরাং উহাতে উল্লিখিতরূপ ভুলভ্রান্তির প্রশ্রয় পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সং

পৌঁছিয়া এক দিবস নিশাকালে বৃক্ষতলে বসিয়া লালা ভকতের সঙ্গে যোগাভ্যাস করিতেছি, এমত সময় উপরিস্থিত বিহঙ্গদিগের বিকট কণ্ঠরব শুনিয়া চিত্তে ভীত হইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ মঠের ভিতরে ফিরিয়া আসিলাম। শৈলা হইতে কোটগাঙ্গোড়ের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কোটগাঙ্গোড় আহম্মদাবাদের সন্নিকট একটি ক্ষুদ্র সহর। তথায় পৌঁছিয়া বহুসংখ্যক বৈরাগী দেখিতে পাইলাম। বৈরাগীদিগের দলে একটি রাজকন্যা দেখিলাম। রাজকন্যাটি যে কোথাকার, তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। রাজকন্যাটি আমার সহিত পরিহাসাদি করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু তাঁহার পরিহাসরূপ পাপসংকল্প হইতে আপনাকে সর্ব্বদাই বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলাম। কোটগাঙ্গোড়ে তিন মাস কাটিয়া গেল। আমার পরিধানে তখনও রেশমী-পা'ড়ে কাপড় ছিল। তাহা লইয়া তথাকার বৈরাগিগণ প্রায়ই হাস্য-পরিহাস করিতেন। তন্নিমিত্ত আমি সেই মূল্যবান্ বস্ত্র ফেলিয়া দিলাম, এবং বাজার হইতে সামান্য বস্ত্র কিনিয়া আনিয়া পরিধান করিতে লাগিলাম। আমার হাতে তখন তিনটি মাত্র টাকা অবশিষ্ট রহিল। আমি তথায় ব্রহ্মচারী আখ্যা প্রাপ্ত হইলাম।

সিদ্ধপুরে কার্ত্তিকী মেলা বসিবে। মেলাস্থলে বহু শ্রেণিস্থ যোগী-সন্ন্যাসাদিগের সঙ্গ লাভ করিতে পারিলে, হয়ত আমার অভীপ্সিত বিষয়ে কিছু না কিছু ফল-লাভ করিতে পারিব ; এই

আশা করিয়া আমি এক দিবস কোটগাঙ্গোড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সিদ্ধপুরের পথে একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইল। পরিচিত লোকটি আমাদিগের বাড়ীতে যাইয়া সমস্ত কথা প্রকাশিত করিল। আমার উদ্দেশে ইতঃপূর্ব্বেই চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান চলিতেছিল। এরূপ অবস্থায় আমার সংবাদ পাইবামাত্র, পিতা চারিজন সিপাহী সমভিব্যাহারে সিদ্ধপুরে আসিলেন। এক দিবস বসিয়া রহিয়াছি, এমত সময়ে পিতৃদেব আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পিতার আকস্মিক উপস্থিতিতে ভয়ে জড়-সড় হইলাম, এবং পাছে আমার প্রতি কোনরূপ কঠোর বা নির্দ্দয় ব্যবহার করেন, এই আশঙ্কায় পিতৃ-সমক্ষে প্রণত হইয়া পড়িলাম। আমার প্রতি যখন তিনি নিতান্ত রোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন আমি বলিলাম :—"আমার দোষ কিছুই নাই, জনৈক গোঁসাই কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই আমি এই ভাবে এই স্থলে আসিয়া পড়িয়াছি ; এবং গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য এখনও ইচ্ছুক রহিয়াছি।" ইহা শুনিয়া পিতার কতকটা রোষ-শান্তি হইল বটে, কিন্তু তিনি আমার কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া দিলেন, বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং বাড়ীতে যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিতাম, সেইরূপ এক খানা বস্ত্র পরিধানের জন্য আনিয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন আমার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত দুই জন সিপাহী নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। সিপাহীরা আমার প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিত,—রাত্রিতে তাহাদিগের

একজন না একজন আমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। এদিকে আমিও কিন্তু পলাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। সিপাহী কখন নিদ্রিত হয় কি না, তাহা দেখিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতাম। অথচ কৃত্রিম নাসাধ্বনির দ্বারা সিপাহীর মনে ধারণা জন্মাইয়া দিতাম যে, আমি প্রতিরাত্রিই প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকি। এইরূপ উপর্য্যুপরি জাগরণে আমার তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। চতুর্থ রাত্রিতে সিপাহী যখন আর জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া নিদ্রাগত হইল, আমি তখন প্রকৃত সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া শয্যা-ত্যাগ করিলাম, এবং হাতে একটা জলপাত্র লইয়া শৌচাচার সমাপনের ব্যপদেশে বহির্গত হইলাম। একবারে সহরের বহির্ভাগে আসিয়া একটা উদ্যান পাইলাম, উদ্যান-মধ্যস্থিত একটা বৃক্ষোপরি সত্বর আরোহণ করিলাম, এবং বৃক্ষারূঢ় থাকিয়া সমস্ত দিবাভাগটাই অনশনে কাটাইলাম। অতঃপর সন্ধ্যার অন্ধকারে মেদিনীর মুখাচ্ছাদিত হইবামাত্র বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলাম, এবং স্বদেশ ও স্বজনদিগের নিকট চিরদিনের মত বিদায় লইয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। এই ঘটনার পর আমার স্বগ্রাম-বাসীদিগের সহিত প্রয়াগে একবার মাত্র আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমার পরিচয় সম্পর্কে তাহাদিগকে তখন কিছুই বলি নাই।

নর্ম্মদার তীরভূমি পরিভ্রমণের অভিপ্রায়ে আমি সিদ্ধপুর হইতে নর্ম্মদা প্রদেশে যাইয়া উপনীত হইলাম। তথায়

যোগানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। যোগানন্দের নিকট কৃষ্ণ শাস্ত্রী নামে একটি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ থাকিতেন। কৃষ্ণ শাস্ত্রীর সমীপে কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়া, পরে রাজগুরুর নিকট যাইয়া বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। বয়ঃক্রম যখন তেইশ কিংবা চব্বিশ, তখন চাণোদে একজন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা সাতিশয় বলবতী থাকায়, এবং সে পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বিবেচনা করায়, আমি উক্ত সন্ন্যাসীটির নিকটে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। সন্ন্যাস-দীক্ষা লইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করিলাম। আমার দণ্ড-গাছটি গুরুদেবের নিকট রাখিয়া দিলাম। চাণোদে দুইটি রাজযোগী গোঁসাইর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে আহম্মদাবাদে আসিলাম। তথায় জনৈক ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। ব্রহ্মচারীর নিকটে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিলাম, শেষে তাঁহার সংসর্গ বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিদ্বারে চলিয়া আসিলাম।

হরিদ্বারে তখন কুম্ভের মেলা। হিমাচলের যে স্থল হইতে অলকনন্দার ধারা নির্গত হইতেছে, সেই স্থল দেখিবার নিমিত্ত হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিলাম। অলকনন্দার জলে বস্তুবিশেষের আঘাত লাগাতে, পাদতল হইতে এতই রক্ত-ক্ষরণ আরম্ভ হইল, এবং তদ্দ্বারা শরীর এতই কাতর হইয়া পড়িল যে, একবার মনে করিলাম ইতস্ততঃ-প্রক্ষিপ্ত বরফ-মালার মধ্যে পড়িয়াই না হয় প্রাণটা ত্যাগ করি। কিন্তু অন্তরে জ্ঞানার্জ্জন-

লালসা একান্ত প্রবলা ছিল বলিয়াই সে কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, এবং মথুরাধামে বিরজানন্দ স্বামী নামক সুপণ্ডিত সাধুর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বিরজানন্দের বয়ঃক্রম তখন একাশীতি বৎসর। তিনি পূর্ব্বে আলোয়ারে থাকিতেন। বেদাদি আর্য-গ্রন্থের প্রতি বিরজানন্দের যেমন গভীর অনুরাগ ছিল, শেখর-কৌমুদ্যাদি নবীন গ্রন্থ-মালার প্রতি তাঁহার তেমনই অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তিনি ভাগবদাদি পুরাণ গ্রন্থসমূহের প্রবল শত্রু ছিলেন। বিরজানন্দ অন্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার পাকাশয়ে একটি বেদনা ছিল। আমি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে কতকটা অভিজ্ঞ ছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়াইতে লাগিলেন। *

* স্বামিজীর পাঠসম্পর্কীয় উল্লিখিত বৃত্তান্তটি ঠিক নহে। স্বামী বিরজানন্দ যে তাঁহাকে প্রথম হইতেই "বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়াইতে লাগিলেন" একথাটি ভুল। কারণ বিরজানন্দ যেমন সিদ্ধান্তকৌমুদী ও শেখরচন্দ্রিকাদি ব্যাকরণের একান্ত বৈরী ছিলেন, তেমনই অষ্টাধ্যায়ী-মহাভাষ্যাদি গ্রন্থের একান্ত পক্ষপাতিত্বও করিতেন। অষ্টাধ্যায়ী-মহাভাষ্য উত্তমরূপে অধিগত না করিয়া বেদাদিগ্রন্থপাঠে অগ্রসর হইলে যে কোন ফলই ফলিবে না, বিরজানন্দ তাহা সকল সময়ে সকল বিদ্যার্থীকেই বলিতেন। এই হেতু যে কোন বিদ্যার্থীই —যে কোন ব্যাকরণ-নিপুণ বিদ্যার্থীই তাঁহার নিকট আসিতেন, তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই অষ্টাধ্যায়ী হইতে পাঠারম্ভ করাইতেন। এরূপ স্থলে স্বামিজী আসিয়া তাঁহার নিকট প্রথম হইতেই "বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন," ইহা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইবে? এ বিষয়ে আরও প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ফলতঃ স্বামিজীর এই স্ববর্ণিত জীবনবৃত্তান্তটিতে, এই প্রকারের অনেক ভুল-ত্রুটিই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আর ভুল-ত্রুটি প্রবিষ্ট হইবেই বা না কেন? কারণ স্বামিজী যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাই যে ঠিক ঠিক

মথুরায় আমার অধ্যয়ন এবং অবস্থিতি সম্পর্কে অমরলালের বিশেষ সহায়তা ছিল। আহার এবং গ্রন্থাদি বিষয়ে প্রচুর সাহায্যের জন্য আমি অমরলালের নিকট সাতিশয় বাধিত হইয়া রহিয়াছি। তিনি আমার ভোজন সম্বন্ধে এতদূর যত্নপর ছিলেন যে, আগে আমার ভোজনের বন্দোবস্ত না করিয়া দিয়া, নিজে কখনও ভোজনে বসিতেন না। অমরলাল বস্তুতই একজন মহদাশয় ব্যক্তি ছিলেন।

বিরজানন্দের নিকট পাঠসমাপ্তির পর আগ্রায় আসিয়া দুই বৎসর কালযাপন করিলাম। আমার চিত্ত তখনও সময়ে সময়ে সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইত। এই কারণ আমি কখন মথুরায় যাইয়া গুরুদেবকে প্রশ্ন করিতাম, কখন বা পত্র-যোগে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতাম।

আগ্রা হইতে গোয়ালিওরে আসিলাম। গোয়ালিওরে বৈষ্ণবমতের প্রতিবাদ আরম্ভ করিলাম। এখানে অনুমভাচার্য্য

লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল, এরূপ মনে হয় না। তাহার পর স্বামিজী যাহা বলিয়াছিলেন হিন্দিতে, অনুবাদিত হইল তাহা মারহাট্টিতে। আবার মারহাট্টির অনুবাদ হইল ইংরাজিতে। অন্ততঃ মারহাট্টি অনুবাদটি—জ্ঞানপ্রকাশ পত্রে প্রকাশিত জীবনবৃত্তটিও যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলেও উহার কোন্ ভুলটি কিরূপে ঘটিয়াছে, তাহার কতকটা আলোচনা হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুনায় যাইয়া সবিশেষ অনুসন্ধান এবং পরিশ্রম করিয়াও, কি জ্ঞানপ্রকাশ কার্য্যালয়ে—কি অন্যত্র—কোথাও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের যে সংখ্যাগুলিতে উপস্থিত জীবনবৃত্তটি প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সংখ্যাগুলির জ্ঞানপ্রকাশ কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সং

নামে এক জন "মাধব"* শাস্ত্রার্থ শুনিবার জন্য আমার নিকট প্রায়ই আসিতেন; এবং আমার মুখ হইতে যখনই কোন অশুদ্ধ শব্দ বাহির হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আমাকে দেখাইয়া দিতেন। তিনি কে? বা কোন্ পদাভিষিক্ত? ইহা বহুবার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, এক জন কাকু´ণ ভিন্ন তিনি অপর কেহই নহেন; আর তিনি যাহা কিছু শিখিয়াছেন, তাহা লোকের মুখে শুনিয়া শুনিয়াই শিখিয়াছেন। এক দিবস ব্যাখ্যানের সময় তিলক-রেখার প্রতিবাদচ্ছলে বলিলাম যে, যদি ললাটকে একটিমাত্র রেখায় অঙ্কিত করিলে বৈষ্ণবদিগের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে সমগ্র মুখমণ্ডলকে কৃষ্ণরেখা-মালায় রঞ্জিত করিলে, তাঁহারা কি মোক্ষ অপেক্ষা আরও কিছু উচ্চতর বস্তু লাভ করিতে পারেন না? ইহা শুনিয়া তিনি সাতিশয় রুষ্ট হইলেন, এবং আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। অনুসন্ধান করিয়া শেষে জানিতে পারিলাম যে, তিনি অনুমন্তাচার্য্য। † গোয়ালিয়র হইতে কেরোলিতে আসিলাম। তথায় জনৈক কবীর-পন্থী সাধুর সহিত আলাপ হইল। তিনি কবীর কথাটা শুদ্ধ

* এই স্থলে "মাধব" বলিতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব বুঝাইবে। দক্ষিণাপথে এই শব্দ প্রায়ই সম্প্রদায়-বাচকরূপে ব্যবহৃত হয়। তৎপ্রদেশে "মাধব" এবং "মাধ্ব" দুইই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সং

† অনুমন্তাচার্য্য কথাটি ভুল। তাঁহার প্রকৃত নাম হনুমন্তাচার্য্য। হনুমন্তাচার্য্য গোয়ালিওর রাজসভার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। সং

করিয়া "ইকবীর" বলিলেন। * কবীরোপনিষদ্ নামে এক-খানি উপনিষদেরও তিনি নামোল্লেখ করিলেন। অতঃপর কেরোলি হইতে জয়পুরে পৌঁছিলাম। জয়পুরে তখন বৈষ্ণব-মতের সহিত শৈবমতের সংঘর্ষণ চলিতেছিল। আমি পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্রকে পরাভূত করিয়া শৈবমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলাম। † জয়পুরের মহারাজ শৈবমত গ্রহণ করিলেন। ‡ তাঁহার দেখাদেখি তথাকার শত শত লোক শৈবমতাবলম্বী হইতে লাগিল। এই ঘটনা লইয়া তথাকার লোক এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং শৈবমতের এতটা পক্ষপাতিত্ব করিতে লাগিল যে মহারাজের হাতী-ঘোড়াকে পর্য্যন্তও রুদ্রাক্ষমালায় সুসজ্জিত করিয়া তুলিল। আমিও তখন স্বহস্তে সহস্র সহস্র রুদ্রাক্ষ বিতরণ করিলাম। অতঃপর জয়পুর হইতে পুষ্করে আসিলাম। পুষ্কর হইতে আজমীরে পৌঁছিয়া শৈব-

* "ইকবীর" কথার কিরূপে সৃষ্টি হইল বলিতে পারি না। এই জীবনবৃত্ত-সংঘটিত অপরাপর ভুলের মত ইহাও বোধ হয় একটি ভুল। এরূপ ভুল বানান-ঘটিত হওয়াই খুব সম্ভব। সং

† স্বর্গীয় পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্রের সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর বৈষ্ণবমত লইয়া জয়পুরে কোন বিচার হয় নাই, এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া স্বামিজী তাঁহার সমক্ষে শৈবমতের প্রাধান্যও কখন প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। হরিশ্চন্দ্র ত শৈবপক্ষ সমর্থনের জন্যই মহারাজ রামসিংহ কর্ত্তৃক জয়পুরে আনীত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার নিকটে আবার শৈবমতের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবেন কি? তবে হরিশ্চন্দ্রের সহিত স্বামিজীর অপর বিষয়ে বিচার হইয়াছিল, সে কথা যথাস্থলে উল্লিখিত হইবে। সং

‡ মহারাজ তখন শৈবধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন নাই। উল্লিখিত ঘটনার পূর্ব্বেই তিনি শৈবমতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সং

মতেরও খণ্ডন করিতে লাগিলাম। রাজা রামরাজ * তখন গভর্ণর জেনেরল কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আগ্রায় যাইতেছিলেন। বৃন্দাবন হইয়া তাঁহার আগ্রায় পৌঁছিবার সংকল্প ছিল। সে জন্য তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কারণ বৃন্দাবনের খ্যাতনামা পণ্ডিত রঙ্গাচার্য্য বিচারার্থী হইয়া আসিলে আমি তাঁহার সম্মুখীন হইব,—বিশেষতঃ রঙ্গাচার্য্যকে পরাভূত করিয়া শৈবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিব। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে আমি শৈবমতেরও প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছি, তখন আমাকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি জয়পুর হইতে মথুরায় আসিলাম, এবং আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া মনের যাহা কিছু সংশয় সমস্তই নিরাকৃত করিয়া লইয়া হরিদ্বারে যাত্রা করিলাম।

হরিদ্বারে আমার নিবাস-ভূমির উপরে পাষণ্ড-মর্দ্দন নামে এক পতাকা উত্তোলিত করিলাম। তজ্জন্য নানা লোকের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রার্থ আরম্ভ হইল। তখন এই মনে হইল যে সাংসারিক লোকের মত কতকগুলি পুস্তক এবং কতকগুলি অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে রাখিয়া কি করিব? আর সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কেনই বা শত্রুর দল বৃদ্ধি করিতে যাইব? সংসার-প্রবাহ যে ভাবে চলিতেছে, সেই ভাবেই চলুক, উহার প্রতিকূলে আমার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি?

---

* রাজা রামরাজ—মহারাজ রাম সিংহ। সং

এইরূপে আপনাপনি প্রশ্নোত্তর করিয়া শেষে সঙ্গের যাবতীয় গ্রন্থ এবং দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করিয়া দিলাম। শরীরে ভস্ম-লেপন করিয়া, এবং নিকটে একটিমাত্র কৌপীন রাখিয়া মৌনী হইলাম। গত বৎসরে যখন বোম্বাইতে আসি, তখন পর্য্যন্ত আমার ভস্মলেপনের অভ্যাস ছিল। কিন্তু রেলপথে যাতায়াতের নিমিত্ত যেমন বাধ্য হইয়া ভস্মলেপনের অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তেমনই আমাকে বস্ত্রাদিও ধারণ করিতে হইয়াছে। আমি মৌনী হইয়া অধিক দিন থাকিতে পারি নাই। কারণ একদা কোন ব্যক্তি আমার কুটীরদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া নিগমকল্পতরোর্গলিতম্ ফলম্ ইত্যাদি আবৃত্তি পূর্ব্বক যখন বলিতে লাগিলেন :—"শ্রীমদ্ভাগবৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর কিছুই নাই,—এমন কি বেদও শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট নিকৃষ্ট," তখন আমি আর মৌনী হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তদ্দণ্ডেই মৌনব্রত ত্যাগ করিলাম এবং শ্রীমদ্ভাগবতের খণ্ডনে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলাম। পরিশেষে ইহা স্থির করিলাম যে, যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা পৃথিবীবাসীর সমক্ষে প্রচারিত করাই আমার পক্ষে বিধেয়। এইরূপ স্থির করিয়া হরিদ্বার হইতে একেবারে ফরাক্কাবাদে আসিলাম। ফরাক্কাবাদ হইতে পুনরায় রামগড়ে * পৌঁছিলাম। তথাকার পণ্ডিত-দিগের সহিত শাস্ত্রার্থ হইল। পণ্ডিতেরা আমাকে "কোলা-

* উহা রামগড় নহে—রামঘাট। রামঘাট আলিগড় জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতট-বর্ত্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সং

হল স্বামী” উপাধি দিলেন। সেখানকার কতকগুলি শাস্ত্রী একত্র হইয়া একসঙ্গে আমাকে একাধিক প্রশ্ন করিবার যখন উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, আমি তখন তাঁহাদিগের সে প্রকার শাস্ত্রার্থকে শাস্ত্রার্থ না বলিয়া কোলাহল বলিলাম। বোধ হয় তজ্জন্যই তাঁহারা আমাকে “কোলাহল স্বামী” নামে আখ্যাত করিলেন। তথায় আমাকে হত্যা করিবার জন্য চিত্রণগড় * হইতে দশ জন দুর্ব্বৃত্ত আসিল। আমি তাহা জানিতে পারিয়া বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলাম। অতঃপর ফরাক্কাবাদে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে কাণপুরে আসিলাম। কাণপুর হইতে প্রয়াগে পৌঁছিলাম। প্রয়াগেও আমার প্রাণবধের নিমিত্ত কএক জন দুষ্ট লোক নিয়োজিত হইল। কিন্তু মহাদেবপ্রসাদ নামক জনৈক ব্যক্তির প্রযত্নেই সে-যাত্রা রক্ষা পাইলাম। মহাদেবপ্রসাদ † এক জন সজ্জন পুরুষ ছিলেন। এই মহাদেবপ্রসাদই কিছুদিন পূর্ব্বে প্রয়াগ-

* রামঘাটের সন্নিকটে,—উপরে কিংবা নিম্নে চিত্রণগড় বলিয়া কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে রামঘাটের কিয়দ্দূরে গড়িয়াঘাট নামে এক স্থান আছে। কিন্তু চিত্রণগড়ে আর গড়িয়াঘাটে নামগত আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সং

† এলাহাবাদবাসী বহুতর প্রাচীন এবং প্রতিষ্ঠিত লোকদিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও উল্লিখিত মহাদেবপ্রসাদ সম্পর্কে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। এমন কি, পূর্ব্বোক্তরূপ বিজ্ঞাপন-প্রচারকারী মহাদেবপ্রসাদ প্রয়াগে কেহ কখন ছিলেন বলিয়াও প্রয়াগবাসীদিগের অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ইহাতে অনুমিত হয় যে, তিনি মহাদেবপ্রসাদ না হইয়া অপর কোন নামধারী হইবেন। ফলতঃ এ প্রকারের ভুল-ত্রুটি উপস্থিত জীবনবৃত্তটিতে যে কতই ঘটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। সং।

বাসী পণ্ডিতদিগের নিকট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, তিন মাসের মধ্যে আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিতে না পারিলে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিবেন। বলা বাহুল্য যে আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিয়া আমিই তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্ম-পরিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত করিলাম।

প্রয়াগ হইতে রামনগরে উপস্থিত হইলাম। রামনগরপতির ইচ্ছা যে কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আমি শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্ত হই। তদনুসারে রামনগর হইতে কাশীতে আসিলাম। কাশীস্থ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রার্থ-স্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বেদে প্রতিমা শব্দ আছে কি না? আমি বলিলাম আছে, কিন্তু সে প্রতিমার অর্থ পরিমাপ। কাশীর বিচার পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা করিলে তাহা সকলেই দেখিতে পারেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থই যে প্রকৃত ইতিহাস-পদবাচ্য, একথাও কাশীর সভায় প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এ যাত্রা কাশীতে আমার চতুর্থ যাত্রা। আমি কাশীতে যখনই গিয়াছি, মূর্ত্তিপূজা বেদ-প্রতিপাদিত কি না? তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলীকে তখনই প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু তাহা দেখাইবার জন্য আজি পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই আমার সম্মুখীন হয়েন নাই। আমি এইরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছি। গত দুই বৎসরের ভিতর কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাণপুর ও জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে সহস্র সহস্র লোকের

নিকটে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছি। কাশী ও ফরাক্কাবাদ প্রভৃতি সহরে তিন চারিটি সংস্কৃত পাঠশালাও স্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধ্যাপকগণের একান্ত সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার জন্যই আশানুরূপ ফল না ফলাতে কিয়দ্দিবস পরে পাঠশালাগুলি তুলিয়া দিতে হইয়াছে।

গত বৎসরে আমি বোম্বাইতে আসিয়াছি। বোম্বাই নগরে "গোঁসাইজী মহারাজ মতে"র * প্রতিকূলে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছি। বোম্বাইতে একটি আর্য্য-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাই হইতে আহম্মদাবাদে, এবং আহম্মদাবাদ হইতে রাজকোটে যাইয়া বৈদিক ধর্ম্ম বিস্তারিত করিয়াছি। বিগত দুই মাস কাল আপনাদিগের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতেছি। ফলতঃ আমার জীবনের ইহাই যাহা কিছু ইতিহাস। আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয়-কল্পে উৎকৃষ্ট প্রচারকদলের নিতান্ত আবশ্যক। এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই বৃহৎ ও দুরূহ কার্য্য কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই মহান্ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার যথাশক্তি সমর্পণ করিতে আমি কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। ভারতভূমির সর্ব্বত্র আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং তদ্দ্বারা দেশের কুরীতি ও কদাচারসমূহ নির্ম্মূল হইয়া যাউক, ইহা আমার কামনা। দেশের সকল

* বল্লভাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুগণ "গোঁসাইজী মহারাজ" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই হেতু "গোঁসাইজী মহারাজের মত" বলিলে—বল্লভ-প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত বুঝাইবে। সং।

স্থানেই বেদাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যাত এবং আলোচিত হউক, আমার স্বদেশবাসী লোকেরা জাগরিত হইয়া উঠুক, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য আমি পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং পরমাত্মা আমার এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন বলিয়া ভরসা করিতেছি।

লিখিত ।

দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত।

২

[থিওসফিষ্ট পত্রিকায় লিখিত। *]

আমি—দয়ানন্দ সরস্বতী কাঠিবারে মর্ব্বি রাজার অধীন কোন নগরে † এক উদীচ্য ব্রাহ্মণবংশে ১৮৮১ সম্বতে জন্ম-

* এই বৃত্তান্তটি স্বামিজী সম্ভবতঃ থিওসফিষ্ট [Theosophist] সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া থিওসফিষ্ট পত্রিকার জন্যই লিখিয়াছিলেন। তিনি হিন্দীতে লিখিয়া দিতেন, পরে তাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া থিওসফিষ্ট পত্রে প্রকাশিত হইত। ঠিক উপর্য্যুপরি না হইলেও, তিন সংখ্যার [১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর ও ডিসেম্বর, এবং ১৮৮০র নবেম্বর সংখ্যা] থিওসফিষ্টতে তিন বারে ইহা বাহির হইয়াছিল। যখন ইহা থিওসফিষ্টতে প্রথম বাহির হইয়াছিল, তখন নানা অংশে ইহার অলৌকিকত্ব দর্শনে ভারতীয় অপরাপর পত্র-পত্রিকাগুলি একবাক্যে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। * মূল প্রবন্ধ—হিন্দীর সহিত এই ইংরাজি অনুবাদটির যতদূর তুলনা করা গিয়াছে, তাহাতে কোন কোন সামান্য বিষয়ে মূলের সহিত অনুবাদের একতা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। তাহা হইলেও অনুবাদকার্য্যে এরূপ ত্রুটি সর্ব্বত্রই উপেক্ষণীয়। যাহা হউক এই বাঙ্গালা জীবনবৃত্তটি উল্লিখিত ইংরাজিরই অনুবাদ-মাত্র। অবশ্য অনুবাদের সময়ে যেমন ভাষা অপেক্ষা ভাবরক্ষার দিকেই অধিকতর প্রয়াস করিয়াছি, তেমনই মূল হিন্দীর সহিত থিওসফিষ্টের ইংরাজি অনুবাদটিও স্থানে স্থানে মিলাইয়া দেখিয়াছি। সম্পাদক

† মূলে আছে "কস্‌বে" কস্‌বে শব্দ পার্শি। উহার অর্থ ক্ষুদ্র নগর, অথবা হাটবাজার-বিশিষ্ট বড় গ্রাম। অনুবাদে কিন্তু লিখিত হইয়াছে—"town"। সং

* Our revered brother the Swami Dayanund Saraswati continues in this number his autobiographical narrative, which the whole Indian Press has declared the most interesting portion of our journal. The Theosophist 1879, December, P. 57.

গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে প্রথম হইতেই পিতার নাম, এবং জন্মভূমির সংবাদ কাহাকেও বলি নাই, সে কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই বলি নাই। কারণ কোন স্বজন বা আত্মীয় ব্যক্তি জানিতে পারিলে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তাহা হইলে,—অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনদিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ঘটিলে আমাকে নিশ্চয়ই গৃহে ফিরিতে হইবে। গৃহে যাইলে আমাকে অর্থস্পর্শ * করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষাদি কার্য্যেও প্রবৃত্ত রহিতে হইবে। এরূপ হইলে ধর্ম্মসংস্কাররূপ যে পবিত্র ব্রতে আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছি, সে ব্রত অসিদ্ধ বা অনুদ্‌যাপিত হইয়া থাকিবে।

বয়ঃক্রম যখন পাঁচ বৎসরের কাছাকাছি, তখন আমি দেবনাগর অক্ষরশিক্ষা আরম্ভ করিলাম। সেই সময় হইতেই পিতামাতা এবং অপরাপর বয়োবৃদ্ধ অভিভাবকবর্গ আমাদিগের কৌলিক প্রথানুসারে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তদনুসারে আমি বহুতর শ্লোক, মন্ত্র ও কবিতাদি কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলাম। আট বৎসরের সময়ে উপনীত হইয়া সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমতঃ রুদ্রাধ্যায় অভ্যস্ত করিয়া পরে যজুর্ব্বেদ পড়িতে লাগিলাম। আমাদিগের পরিবার শৈবমতাবলম্বী ছিল বলিয়া, আমাকেও শৈবমতে শিক্ষিত দীক্ষিত

* অর্থ-স্পর্শ বা অর্থ-ব্যবহার সন্ন্যাসী-পরমহংসদিগের রীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে উহা গর্হিত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সং

করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি তজ্জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই পার্থিব-পূজায় আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হইলাম। কিন্তু শিবার্চ্চনা-কার্য্যে সময়ে সময়ে উপবাসাদির কঠোরতা সহ্য করিতে হইত বলিয়া,—বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত সকালে আহার করা আমার অভ্যাস ছিল বলিয়া, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় মাতাঠাকুরাণী আমাকে প্রতিদিন শিবপূজা করিতে নিষেধ করিতেন। পিতার তাহা কিছুতেই সহ্য হইত না। সে জন্য ইহা লইয়া পিতার সহিত মাতার প্রায়ই কলহ ঘটিতে লাগিল।

আমি ইহার মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ-শিক্ষা করিলাম। বেদ-মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলাম। তদ্ভিন্ন পিতার সহিত কোন দেবালয়ে, কখন বা কোন শিবার্চ্চনার স্থলে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। আমার সহিত পিতা যখনই কোন কথাবার্ত্তা বলিতেন, তখনই তিনি একই বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেন। শিবারাধনাই যে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম,—সুতরাং শিবভক্তিই যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, পিতৃদেব আমাকে কেবল এই কথাই বলিতেন ও বুঝাইতেন। যাহা হউক আমি চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই ব্যাকরণ ও শব্দরূপাবলী অভ্যস্ত করিয়া, এবং সমগ্র যজুর্ব্বেদ ও অন্যান্য বেদের কিছু কিছু অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া আমার পাঠকার্য্য একরূপ সমাপ্ত করিলাম।

আমার পিতার তেজারতি কারবার ছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি

জমাদার * ছিলেন। জমাদারী কার্য্য আমাদিগের কুলপরম্পরাগত ছিল। এই সকল কারণে আমাদিগের সংসারে কোনরূপ ক্লেশ বা অভাব ছিল না।

যে স্থলে শিবপুরাণ পঠিত এবং ব্যাখ্যাত হইত, পিতা সেই স্থলেই আমাকে লইয়া যাইতেন। জননীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি আমাকে প্রতিদিনই শিবপূজা করিতে বলিতেন। ফলতঃ এইরূপে কিছুদিন গত হওয়ার পর, একবার যখন শিবরাত্রি উপস্থিত হইল, তখন শিবরাত্রির ব্রতগ্রহণ করিবার জন্য পিতা আমাকে আদেশ করিলেন। আমার অসুস্থ হইয়া পড়িবার পক্ষে প্রবল প্রতিবাদ হইলেও, পিতা তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া আমাকে বলিলেন ;—তুমি আজি উপবাসী থাকিবে, শিবালয়ে গিয়া রাত্রি-জাগরণ করিবে,—কারণ তোমাকে আজি পবিত্র শৈবদীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। তদনুসারে আমি অন্যান্য যুবকদিগের সহিত মিলিত হইয়া পিতার অনুগমন করিলাম, এবং যথাকালে শিবালয়ে গিয়া পৌঁছিলাম। শিবরাত্রির শিবপূজা চারি প্রহরে চারিটি। আমি দ্বিতীয় পূজাটি সমাপ্ত করিয়া বসিয়া আছি, এমন

* জমাদার শব্দের অর্থ স্বামিজী নিজেই বলিয়াছেন—"নগরের ফৌজদার এবং রাজস্ব-সংগ্রহকার দুইই" ।*

* মূলে কিন্তু জমাদার শব্দ নাই। মূলের অংশটি এই :—

"मेरे घरानेमें साहूकारी व देने लेनकी वृत्ति थी और कुलपरम्परागत जमीदारी भी चली आती थी"।

সময়ে,—অর্থাৎ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে দেখিলাম যে কি মন্দিরের পূজারি, কি পরিচারক, কি মন্দিরাগত গৃহস্থ ব্রতধারী সকলেই মন্দিরের বাহিরে যাইয়া নিদ্রিত হইতে লাগিল। আমি বহুদিবস যাবৎ শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ব্রতধারীর পক্ষে নিদ্রিত হওয়া বড়ই গর্হিত। কারণ তাহা হইলে যেমন ব্রতভঙ্গ হইয়া যায়, তেমনই ব্রত-নির্দ্দিষ্ট ফললাভেও বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং প্রবল নিদ্রাবেগে মাঝে মাঝে অবসন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম ঘটিলেও চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ জলসেচন করিয়া আমি জাগিয়া রহিলাম। আমার পিতৃদেব কিন্তু সকলের অগ্রেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

নিশীথের সেই নিস্তব্ধ শিবালয়ে একাকী বসিয়া বহুতর চিন্তায় বিচলিত হইতে লাগিলাম। চিন্তা-বিচলিত চিত্তে একটির পর একটি করিয়া প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। আমি আপনাকে আপনিই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম যে, যিনি বিচরণ করেন,—যিনি ভোজন করেন,—যিনি পান করেন,—নিদ্রিত হয়েন,—হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিতে পারেন,—ডম্বরু বাদন করেন, এবং মনুষ্যকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকেন; তিনিই কি এই সম্মুখস্থিত বৃষারূঢ় দেবতা? যিনি কৈলাসপতি মহাদেব বলিয়া মনুষ্যের আরাধ্য,—পৌরাণিক প্রসঙ্গমালার মধ্যে যিনি পরাৎপর পরব্রহ্ম বলিয়াই বর্ণিত, তিনিই কি এই মূর্ত্তি? প্রশ্নটি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠাতে, পিতাকে জাগাইয়া তুলিলাম। পিতা জাগরিত হইলে পর, অণুমাত্রও সঙ্কোচ না

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমার সম্মুখস্থিত এই বিকট-শিবমূর্ত্তিটিই কি সেই শাস্ত্রবর্ণিত মহাদেব ? ইহা শুনিয়া পিতা বলিলেন,—তুমি এরূপ প্রশ্ন করিতেছ কেন ? আমি বলিলাম এই মূর্ত্তিটিই যদি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ জীবন্ত ঈশ্বর হয়েন, তাহা হইলে আপনার গাত্রোপরি মূষিকসমূহ সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া, এবং মূষিক-স্পর্শ নিমিত্ত শরীরে অপবিত্র হইয়াও ইনি কোন অংশেই কিছু বিরক্তি বা অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করিলেন না কেন ? পিতা তখন আমাকে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন;—"এটি ত কৈলাসপতি মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তিই বটেন, কিন্তু তাহা হইলেও শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ইনি সেই সাক্ষাৎ মহাদেবের তুল্যই হইয়াছেন। বিশেষতঃ এই কলুষ-কলঙ্ক-পরিপূরিত কলিযুগে মহাদেবের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার-লাভ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হেতু, সাধকেরা এই পাষাণ-প্রতিমূর্ত্তিকেই প্রকৃত মহাদেববোধে পূজা করিয়া আসিতেছেন। আর এই পাষাণ-প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিয়াই যখন তাঁহারা প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ মহাদেব-পূজার ফললাভ করিতেছেন, তখন এই পাষাণ-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যেই যে প্রকৃত মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন, তাহা ত বুঝিয়া লইতে হইবে"। পিতৃদেবের উক্তবিধ ব্যাখ্যায় আমি পরিতুষ্ট হইতে পারিলাম না। তাঁহার কথাগুলির মধ্যে আমি সুযুক্তি বা সরল ভাব কিছুই পাইলাম না। এদিকে সাতিশয় ক্ষুধাক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হইয়া

পড়িয়াছিল। এই হেতু গৃহ-প্রত্যাগত হইবার অনুমতি চাহিলাম। পিতা অনুমতি দিয়া সঙ্গে একজন সিপাহী পাঠাইলেন, এবং যাহাতে আমি আহার করিয়া ব্রতভঙ্গ না করি, তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া ক্ষুধাক্লান্তির কথা বলিবামাত্র, মাতা মিষ্টান্নাদি দ্রব্য সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। আমি সেগুলি আহার করিলাম, এবং শয্যায় যাইয়া গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলাম।

প্রাতে গৃহ-প্রত্যাগত হইয়া পিতা যখন শুনিলেন যে, আমি আহার করিয়া ফেলিয়া ব্রতভঙ্গ করিয়াছি, তখন তিনি আমার প্রতি নিতান্ত রোষান্বিত হইয়া উঠিলেন। ব্রতভঙ্গ করিয়া আমি যে কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, তিনি আমাকে তাহাই কেবল বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই পাষাণ-প্রতিমূর্ত্তিটিকে প্রকৃত মহাদেব বলিয়া যখন কিছুতেই বিশ্বাস হইল না, তখন তাঁহার আবার পূজা কি? এবং তজ্জন্য আবার উপবাসাদিই বা কি? কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক মনের এবম্বিধভাব ব্যক্ত না করিয়া পিতাকে বলিলাম যে যখন পাঠাভ্যাস করিতেই আমার সময় কুলায় না, তখন নিয়মিতরূপ পূজার্চ্চনা করা আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে? আমার জননী এবং পিতৃব্য উভয়ই এই কথার সমর্থন করিলেন। তখন পিতাও তাঁহাদিগের সহিত একমত হইয়া পাঠাদি কার্য্যেই অধিকাংশ সময় নিয়োগ করিবার পক্ষে আমাকে আদেশ করিলেন। আমি তখন পাঠ্যবিষয় কিঞ্চিৎ

বিস্তৃত করিয়া লইলাম—নিরুক্ত, নিঘণ্টু, পূর্ব্বমীমাংসা, এবং কর্ম্মকাণ্ডাদির গ্রন্থও আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম।

আমাদিগের সংসারে আমি ভিন্ন আরও দুইজন ভাই এবং দুইটি ভগিনী ছিল। আমার বয়স যখন ষোল, তখন তাহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠটির জন্ম হয়। একদা রাত্রিকালে কোন বন্ধুর গৃহে নৃত্যোৎসব * দেখিতেছিলাম। এমত সময় গৃহ হইতে জনৈক ভৃত্য আসিয়া একটি বিষম সংবাদ দিল। সে বলিল যে, আমার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ভগিনিটি সাংঘাতিক পীড়ায় এইমাত্র পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছে। ভগিনীটির চিকিৎসাকল্পে সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বিত হইলেও, দুঃখের বিষয়, আমরা গৃহ-প্রত্যাগত হওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সেই সহোদরা-বিয়োগ-জনিত শোকই আমার জীবনের প্রথম শোক। সেই শোকে হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। সেই

* উল্লিখিত নৃত্যোৎসবের অর্থ পাঠকদিগের প্রায় সকলের নিকটেই বোধ হয় তয়ফাওয়ালীর নাচ-গান হইবে। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময়ে কাঠিবারে—অন্ততঃ কাঠিবারের মধ্যি অঞ্চলে তয়ফাওয়ালী বা বাইজীর নাচ-গান প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না। তখন তর্গারা নামক একদল নৃত্য-গীত ব্যবসায়ী কাঠিবারে বিদ্যমান ছিল। কোনরূপ আমোদ বা উৎসব উপলক্ষে, প্রয়োজন হইলে লোকে পারিশ্রমিক দিয়া তর্গারাদিগকেই লইয়া আসিত। তর্গারারা বহুরূপীর সাজে সাজিয়া দল বাঁধিয়া নৃত্য-গীত করিত। তর্গারাদিগের নৃত্য-গীত রাত্রিতেই হইত,—দিবাভাগে হইত না। তর্গারাদিগের দলে অধিকাংশই নীচ শ্রেণির ব্রাহ্মণ থাকিত। কাঠিবার হইতে তর্গারাদিগের নৃত্য গীত এখন একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ফলতঃ উপরি-উক্ত নৃত্যোৎসব যে তর্গারাদিগেরই নৃত্য-গীত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সং

শোকাবহ ঘটনার সময়ে আত্মীয়স্বজনগণ আমার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া যখন ক্রন্দন-বিলাপ করিতেছিলেন, আমি তখন পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তির মত অবিচলিত থাকিয়া চিন্তাস্রোতে ভাসিতেছিলাম,—মনুষ্যজীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্বের কথা ভাবিয়া মনে করিতেছিলাম যে, এ পৃথিবীর সকলকেই যখন মরিতে হইবে, তখন আমিও এক দিন নিশ্চয় মরিব। কিন্তু এমত স্থান কোথাও আছে কি না? যেখানে যাইলে মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতে পারি, এবং মুক্তির উপায়ও লাভ করিতে পারি। ফলতঃ সেই স্থলে দাঁড়াইয়া সেই ক্ষণেই ইহা সংকল্প করিলাম যে, ঈশ্বর-অবিশ্বাসীর অবর্ণনীয় মৃত্যুক্লেশ হইতে যাহাতে আপনাকে বাঁচাইতে পারি, এমত কোন উপায় যে কোনরূপেই হউক অবলম্বন করিব। এতদ্ভিন্ন বাহিরের কঠোরতা বা কোন প্রকার বাহ্যানুষ্ঠান যে কোন অংশেই ধর্ম্মলাভের অনুকূল নহে, ইহা যেমন উল্লিখিতরূপ চিন্তা ও বিচারের ফলে সুদৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিলাম, তেমনই আত্মিক প্রযত্নের আবশ্যকতার কথাও দিন দিনই বুঝিতে লাগিলাম। কিন্তু মনের এই সকল ভাব একেবারেই প্রচ্ছন্ন রাখিলাম, —অন্তঃকরণের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষাগুলির বিষয় কাহাকেও কিছুই জানিতে দিলাম না। তখন আমার বয়ঃক্রম আঠার বৎসরমাত্র।

ইহার স্বল্প দিবস পরেই পিতৃব্যের মৃত্যু ঘটিল। পিতৃব্য যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই সাধুচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। আমার

জন্মাবধিই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সুতরাং তাঁহার বিয়োগে আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম যে, সংসারের সকল বস্তুই যখন অস্থায়ী ও চঞ্চল, তখন এমত বস্তু কি রহিয়াছে—যাহার জন্য সংসারে থাকিয়া সাংসারিক লোকের মত জীবনযাপন করিতে পারি? এই ভাবটি হৃদয়ে গুরুতররূপে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কিন্তু কাহারও নিকটে প্রকাশিত না করিলেও, সময়ে সময়ে নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ বন্ধু-দিগের নিকট ইহা বলিয়া ফেলিতাম যে বিবাহ করা ত দূরের কথা,—বিবাহিত হওয়ার কল্পনা পর্য্যন্তও আমার পক্ষে বিরক্তি-কর। এই সকল কথা পিতামাতার কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা তখন আমার বিবাহ সম্বন্ধীয় বাগদান কার্য্য অবিলম্বেই সম্পন্ন করিতে, এবং বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর পূর্ণ হইবামাত্রই আমাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন।

পিতামাতার উল্লিখিত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, তাহাতে বাধা দিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার পক্ষ হইয়া পিতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত বন্ধুদিগকেও অনুরোধ করিলাম। বন্ধুগণ আমার পক্ষ এরূপভাবে সমর্থন করিলেন যে, পরিশেষে পিতৃঠাকুর বাগদান-কার্য্য বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সুযোগে যাহাতে কাশীতে যাইয়া ব্যাকরণ ও জ্যোতিষাদি দুরূহ শাস্ত্রগুলি উত্তম-রূপে আয়ত্ব করিতে পারি, তন্নিমিত্ত সবিশেষ মিনতি সহকারে

পিতার নিকটে প্রস্তাব করিলাম। মাতা এই প্রস্তাবের ঘোরতর বৈরী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, কাশীতে যাইবার প্রয়োজন কি? বিদেশে যাইয়া যাহা শিখিবে, তাহা গৃহে বসিয়াও ত শিখিতে পার। আর তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ, তাহাই বা কোন্ অল্প? বিশেষতঃ অতিরিক্ত মাত্রায় লেখাপড়া শিখিলে যুবকগণ প্রায়ই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে,—বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। অধিকন্তু আগামী বর্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দিব বলিয়া যখন স্থির করিয়াছি, তখন কাশী-যাত্রা তোমার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভাবিত হইবে? সুতরাং কাশী-যাত্রার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে কোন আশাই দেখিলাম না। এমন কি, কাশী-যাত্রার বিষয়ে যতই অনুরোধ করিলাম,—কাশী হইতে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুনিপণ হইয়া না আসা পর্য্যন্ত বাগ্দান কার্য্য স্থগিত রাখিতে যতই অনুনয় করিতে লাগিলাম, মাতাঠাকুরাণী ততই বিরোধী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, এরূপ করিলে বর্ষ-সমাপ্তি পর্য্যন্তও অপেক্ষা না করিয়া, আমরা অবিলম্বেই তোমার বিবাহের আয়োজন করিব। তখন বুঝিলাম যে এ প্রকার জিদে কেবল আত্মপক্ষই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং কাশীযাত্রার প্রস্তাব পরিহার পূর্ব্বক পিতাকে বলিলাম যে, এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে—আমাদিগের জমাদারির অন্তর্গত—গ্রামে যে সুপণ্ডিত অধ্যাপকটি রহিয়াছেন, যদি তাঁহার নিকট যাইয়া আমাকে পড়িবার অনুমতি

দেন, তাহা হইলে স্বদেশে থাকিয়াই আমার পাঠকার্য্য সমাপ্ত করিতে পারি। পিতামাতা উভয়েই ইহাতে সম্মত হইলেন। আমি তখন তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া উল্লিখিত অধ্যাপকটির নিকটে গমন করিলাম, এবং নিশ্চিন্ত-চিত্ত হইয়া কিছু কাল তথায় অধ্যয়নে রত রহিলাম। কিন্তু তথায় থাকিতে থাকিতে, আমার বিবাহ বিষয়ে অনিচ্ছার কথা এক দিবস বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। পিতা কোন্ সূত্রে তাহা জানিতে পারিলেন, এবং অবিলম্বেই আমাকে গৃহে ডাকিয়া লইলেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে বিবাহোপযোগী সমস্ত আয়োজনই প্রায় প্রস্তুত। আমার বয়ঃক্রমও তখন একুশে প্রবিষ্ট। সুতরাং কোন বিষয় লইয়া কোন অংশেই আর কিছু আপত্তি চলিতে পারে না। অতএব তখন স্পষ্টরূপেই বুঝিলাম যে, পিতামাতা যেমন আমাকে আর জ্ঞানালোচনায় রত থাকিতে দিবেন না, তেমনই আমাকে বিবাহিত না করিয়াও তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিবেন না। অগত্যা তখন স্থির করিলাম যে, এমত একটা কিছু করিব—যাহা করিলে আমি আর আমার বিবাহ এই দুই-এর মধ্যে চিরকালের তরে একটা প্রতিবন্ধক থাকিয়া যায়।

এইরূপ স্থির করিয়া ১৯০৩ সম্বতের এক দিন সন্ধ্যাকালে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া চিরদিনের জন্য সংসার পরিত্যাগ করিলাম। চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটা পল্লিতে আসিয়া রাত্রি-যাপন করিলাম। প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার চলিতে

লাগিল্লাম, এবং রাত্রি-সমাগম না হওয়া পর্য্যন্ত পনর ক্রোশ পথ চলিয়া আসিলাম। অবশ্য পথিকেরা সাধারণতঃ যে পথ দিয়া যাতায়াত করে, কিংবা যে সকল পল্লিতে আমাকে চিনিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে, সে সমস্ত পথ বা পল্লির সংস্পর্শেও গেলাম না। এইরূপ সতর্ক হইয়া চলাতে যে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ গৃহত্যাগের তৃতীয় দিবসে একজন সরকারী কর্ম্মচারীর মুখে অবগত হইলাম যে, কোন পলায়িত যুবকের উদ্দেশে কতকগুলি অশ্বারোহী সমেত বহুসংখ্যক লোক দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

যাহা হউক আমাকে শীঘ্রই আবার অন্য গোলযোগের মধ্যে পড়িতে হইল। পথিমধ্যে একদল ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। তাহারা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল যে, তুমি যতই দান করিবে, পরকালে ততই লাভবান্ হইবে। ইহা বলিয়া আমার সঙ্গে যাহা কিছু টাকা ছিল, এবং আমার অঙ্গে স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল; * তাহার সমস্তই তাহারা চাহিতে লাগিল। সে জন্য আমি তাহা-

* কাঠিবার প্রদেশে এক কালে, এরূপ রীতি ছিল যে, কি বালক, কি যুবক সকলেই আপনাপন অবস্থানুরূপ নানারূপ অলঙ্কার শরীরে ধারণ করিত। কোন কোন স্থলে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্তও যুবকদিগের অঙ্গে অলঙ্কার দৃষ্ট হইত। সুতরাং উল্লিখিত সময় পর্য্যন্তও যে দয়ানন্দের দেহে অলঙ্কার থাকিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এক্ষণে এই অলঙ্কারধারণ-প্রথা কাঠিবার হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। সং

দিগকে তৎসমস্তই দান করিলাম, এবং অপেক্ষাকৃত ত্বরিত গতিতে লালা ভকৎ * নামক বিদ্বান্ পুরুষের আলয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথের স্থানে স্থানে যে সকল সাধু ও ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহাদিগের সকলের মুখেই লালা ভকতের সুখ্যাতি শুনিয়া আসিতেছিলাম। লালা ভকৎ শৈলা নগরে অবস্থিতি করিতেন। শৈলাতে একজন ব্রহ্মচারীর সহিত পরিচয় হইল। তিনি ব্রহ্মচারী-আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার পরামর্শ দিলেন। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। তখন তিনি আমাকে ব্রহ্মচারীর দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া শুদ্ধচৈতন্য নাম প্রদান করিলেন। তজ্জন্য আমাকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইল। পরিহিত বস্ত্রগুলি ফেলিয়া দিলাম, এবং ব্রহ্মচারীর পরিচ্ছদ—পীতলোহিত বর্ণ বস্ত্র ধারণ করিলাম। এইরূপে

---

* লালা ভকতের সম্বন্ধে কাঠিবার-গেজেটিয়ার [Kathiwar Gazetteer] নামক গ্রন্থের ৬৪৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—"Saila is famous for the temple of Ram Chandra built by Lala Bhagat a celebrated Vania saint flourished in the begining of the present centnry. Here provisions are daily distributed to travellers, ascetics and others. So famous is the reputation of Lala Bhagat that Saila is often familiarly called the Bhagat's village." উল্লিখিত ইংরাজি অংশটির মর্ম্ম এই :—"লালা ভকৎ-নির্ম্মিত রামচন্দ্রের মন্দিরের জন্য শৈলা প্রসিদ্ধ। লালা ভকৎ একজন বণিকবংশ-সম্ভূত সাধু। তিনি উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। কি পথিক, কি সাধু, কি অপর কেহ সকলকেই ভকতের মন্দির হইতে প্রতিদিন সদাব্রত দেওয়া হইয়া থাকে। ভকতের প্রসিদ্ধি এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, লোকে শৈলাকে শৈলা না বলিয়া "ভকতের গ্রাম" বলিয়াই প্রায় উল্লেখ করিত।" সং

নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া শৈলা হইতে আহম্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী কোটগাঙ্গোড় নামক স্থানে যাইতেছি, এমত সময়ে আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ পথিমধ্যে একটি পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। লোকটি একটি বৈরাগী,—আমাদিগের নিকটস্থ পল্লিবাসী, এবং আমাদিগের পরিবারের সহিত সুপরিচিত। সে আমাকে দেখিয়া যতই বিস্ময়ান্বিত হইতে লাগিল, আমি তাহাকে দেখিয়া ততই হতবুদ্ধির মত হইতে লাগিলাম। এ প্রকার বেশে এতদূরে আসিবার কারণ কি ? জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম যে, পৃথিবীর নানা স্থান পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই বাহির হইয়াছি। তাহা শুনিয়া সে আমার নিন্দা করিল, এবং আমার অভিনব পরিচ্ছদ দেখিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। আমাকে হতবুদ্ধি-ভাবাপন্ন দেখিয়া বৈরাগীটি যদিও আমার ভাবী সংকল্পের বিষয় বুঝিতে পারিল, তথাপি আমি তাহাকে বলিলাম যে, সিদ্ধপুরে কার্ত্তিক মাসে যে মেলা বসিবে, তাহা দেখিবার নিমিত্তই আপাততঃ তথায় যাইতেছি। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বৈরাগীটি চলিয়া গেলে আমি সিদ্ধপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম, এবং নীলকণ্ঠের মন্দিরে যাইয়া বহুতর দণ্ডি-স্বামী ও ব্রহ্মচারীর সহিত অবস্থিত করিতে লাগিলাম। তথাকার বিস্তৃত মেলাভূমিতে নানা শ্রেণির সাধু-সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানী ও পরমার্থপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পবিত্র সঙ্গ নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করত কএক দিন আনন্দে অতিবাহিত করিলাম।

এদিকে উল্লিখিত বৈরাগীটি গৃহে যাইয়া পিতৃদেবের

নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিল। সে আমার সিদ্ধপুর-যাত্রার কথা পত্র দ্বারা পিতাকে জানাইয়াছিল। তদনুসারে পিতা সিপাহী সমভিব্যাহারে সিদ্ধপুরে আসিয়া ধীরে ধীরে আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি প্রায়ই যে সকল স্থলে যাইয়া সাধু-সজ্জনদিগের সহিত সদালাপ করিতাম, তিনি সেই সকল স্থল ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার সংবাদ বাহির করিলেন। এক দিবস প্রাতঃকালে বসিয়া রহিয়াছি, এমত সময়ে পিতৃদেব সহসা আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পিতৃ-মূর্ত্তি তখন ক্রোধে অগ্নিময়। তিনি যার পর নাই তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। এ প্রকার কার্য্য করিয়া আমি যে তাঁহাদিগের পবিত্র কুলকে চিরদিনের নিমিত্ত কলঙ্কিত করিয়াছি, একথাও বলিলেন। আমি তাঁহার কোপ-কষায়িত মূর্ত্তির প্রতি যতই চাহিতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিয়া কোন ফলই হইবে না। এই হেতু তখন করযোড় হইয়া তাঁহার পদে প্রণত হইলাম, এবং সাতিশয় অনুনয় সহকারে তাঁহার কোপ-শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বলিলাম যে, কোন দুষ্ট লোকের পরামর্শ-পরিচালিত হইয়াই আমি এরূপ করিয়াছি, এবং সে জন্য হৃদয়ে একান্ত অনুতপ্ত হইয়াছি। বলিতে কি, আমি গৃহে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমত সময়ে আপনিও দৈবাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতএব চলুন, আমি এই ক্ষণেই আপনার সহিত গৃহে ফিরিয়া যাইব। এ প্রকার মিনতি

ও ত্রুটি স্বীকার সত্বেও পিতার কোপানল একবারে নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি ক্রোধাবেগে আমার পরিহিত বস্ত্র টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িলেন, আমার হাত হইতে তুম্বাটা কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, আমার উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে আমাকে মাতৃহন্তা বলিয়াও অভিহিত করিলেন। তাঁহার সহিত গৃহ-প্রত্যাগত হইবার ইচ্ছা জানাইলেও, তিনি আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার কএকটি সিপাহীর হস্তে দিলেন। সিপাহীরা এক ক্ষণের জন্যও আমাকে না ছাড়িয়া দিবারাত্রি সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে লাগিল।

এদিকে পিতৃসঙ্কল্পের ন্যায় আমার সঙ্কল্পটিও অবিচলিত। সুতরাং সিপাহীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সুযোগ সর্ব্বদাই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। ঘটনাক্রমে সেই রাত্রিতেই সুযোগ ঘটিল। রাত্রি যখন তিনটা, তখন আমাকে নিদ্রাবিষ্ট মনে করিয়া আমার পরিরক্ষক সিপাহীটি নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি তখন উত্তম সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিলাম, জলপূর্ণ তুম্বাটা হাতে লইলাম, খানিকটা হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইলাম, এবং আমার পলায়ন সংবাদ জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই এক মাইল পথ দৌড়িয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে কিয়দ্দূরে যে একটা বড় গাছ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেই গাছটার তলায় পৌঁছিয়া দেখি যে, তাহার কতকগুলি শাখাপ্রশাখা একটা দেবমন্দিরের উপরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহা দেখিয়া সত্বর গাছটির উপরে উঠিলাম, এবং তাহার যে ঘন পল্লবাবৃত শাখাপ্রশাখাগুলি,

সেই মন্দিরের গুম্বজটির উপরে গিয়া লাগিয়া রহিয়াছে, সেই শাখাপ্রশাখাগুলির মধ্যে যাইয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিলাম। ভবিষ্যতে আরও কি ঘটে, তাহা দেখিবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। উষাকাল উপস্থিত হইলে সেই গুম্বজের ছিদ্র দিয়া দেখিতে পাইলাম, সিপাহীগণ আমার উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে সেই মন্দিরের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ পূর্ব্বক একবারে স্পন্দহীন হইয়া বসিয়া রহিলাম। সিপাহীগণ মন্দিরের ভিতর ও বাহির বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াও যখন আমার কিছুই সন্ধান করিতে পারিল না, তখন তাহারা পথ ভুল করিয়া আসিয়াছে বিবেচনা করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। পাছে আবার কোন একটা নূতন বিপদে পড়ি, এই আশঙ্কায় আমি সমস্ত দিবাভাগটাই গুম্বজের উপরে বসিয়া কাটাইলাম। সায়ংকাল হইবামাত্র বৃক্ষ হইতে নামিয়া বিপরীত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতে লাগিলাম। প্রসিদ্ধ পথ দিয়া ত চলিলামই না, তদ্ভিন্ন পথের বিষয়ে কাহাকেও বড় একটা কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। এই জন্য যে আহম্মদাবাদে উপস্থিত হইতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, সেই আহম্মদাবাদে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাকে দুইবার আসিতে হইল। যাহা হউক আহম্মদাবাদে পৌঁছিয়া তদ্দণ্ডেই বড়োদা যাত্রা করিলাম।

বড়োদায় কিছু দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক তথাকার চেতনমঠে ব্রহ্মানন্দ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসীর সহিত বেদান্ত লইয়া

আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমিই যে পরব্রহ্ম,—এই তত্ত্বটি ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ আমাকে উজ্জ্বলরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বেদান্ত পড়িবার সময়ে এই বিষয়টি যদিও কিছু কিছু বুঝিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এইক্ষণে ইহাঁদিগের সহিত চর্চ্চালাপে সর্ব্বতোভাবে সন্দেহমুক্ত হইয়া আমি আপনাকেই ব্রহ্মবোধ করিতে লাগিলাম। বড়োদাতে একটি কাশীবাসিনী স্ত্রীলোকের মুখে শুনিতে পাইলাম যে নিকটবর্ত্তী স্থানবিশেষে কতকগুলি বিদ্বান্ পুরুষের সম্মিলন হইবে। তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় সচ্চিদানন্দ পরমহংসের সহিত আলাপ হইল। তাঁহার সঙ্গে নানা তত্ত্বের আলোচনা করিলাম। সচ্চিদানন্দের নিকটেই শুনিলাম যে চাণোদ-কর্ণালি বহুতর সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর আবাসভূমি।

তদনুসারে চাণোদ-কর্ণালিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চাণোদ-কর্ণালি* নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী একটি পবিত্র স্থান। তথায়

---

* চাণোদ-কর্ণালি পাশাপাশি দুইটি স্বতন্ত্র স্থান। দুইটি স্থানই নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী। চাণোদ ও কর্ণালির মধ্য দিয়া অর বা উরি নদী আসিয়া নর্ম্মদার সহিত মিশিয়াছে। নর্ম্মদামাহাত্ম্যে নাকি লিখিত আছে যে উরি-নর্ম্মদা-সঙ্গমের সন্নিকটে—কোন গুপ্ত স্থান দিয়া সরস্বতী আসিয়াও নর্ম্মদায় পড়িয়াছে। এই হেতু চাণোদ-কর্ণালিকে কেহ কেহ দক্ষিণী-প্রয়াগ বলিয়া থাকেন। চাণোদ একটি ক্ষুদ্র সহর। বড়োদা ষ্টেট-রেলওয়ের ডাবুই লাইন চাণোদে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সুতরাং চাণোদে একটি রেলওয়ে ষ্টেসনও রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন বড়োদা রাজ্যের একটি তহশীল বলিয়া, এখানে গাইকোয়াড় সরকারের বৈভটদার, পুলিশ ও জেলখানা প্রভৃতিও আছে। কর্ণালি কোন অংশেই সহর নহে।

অনেক ব্রহ্মচারী, চিদাশ্রম প্রভৃতি সন্ন্যাসী এবং কতকগুলি যোগদীক্ষিত সাধু-মহাত্মা দেখিতে পাইলাম। ইহার পূর্ব্বে যোগদীক্ষিত সাধু কখন দেখি নাই। প্রথমতঃ কএক দিবস শাস্ত্রালাপের পর আমি পরমানন্দ পরমহংসের নিকটে যাইয়া শিক্ষার্থী হইলাম,—কএক মাস ধরিয়া বেদান্তসার ও বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ অভ্যাস করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারী ছিলাম বলিয়া, তখন আমাকেই স্বহস্তে পাক করিতে হইত। তাহাতে অধ্যয়নের বিঘ্ন ঘটিত। বিশেষতঃ আমি তখন পর্য্যন্তও আমার নাম পরিত্যাগ করি নাই। পিতৃকুলের প্রসিদ্ধিবশতঃ, কাহারও সহিত আলাপে কেহ আমাকে চিনিয়া ফেলেন—অমুক কুলের সন্তান বলিয়া চিহ্নিত করিতে থাকেন, এই ভয়ে মাঝে মাঝে যেমন অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতাম, নামান্তর ধারণ করিবার জন্যও তেমনই চিন্তিত হইয়া উঠিতাম। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে এই দুই গোলমালই মিটিয়া যাইতে

কিন্তু পবিত্রতা, কোলাহলশূন্যতা, এবং রমণীয়তা সম্পর্কে চাণোদ অপেক্ষা কর্ণালিই শ্রেষ্ঠ। কর্ণালিকে একটি শান্তরসাস্পদ তপোভূমি বলিলেও বলা যাইতে পারে। তথায় কুবেরেশ্বর, সোমেশ্বর ও পাবকেশ্বর প্রভৃতির মন্দির বিদ্যমান। কুবেরেশ্বরের ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া নর্ম্মদার বিশাল বক্ষের প্রতি নেত্রপাত করিলে মনে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হয়, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না। নর্ম্মদার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমিই দেবভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও,চাণোদ-কর্ণালির সমীপস্থ স্থানগুলি যেন আরও পবিত্র—যেন আরও দিব্যভাবাপন্ন। এই সকল কারণে সাধু, সন্ন্যাসী, বিরক্ত ও পরমহংস প্রভৃতির অনেকেই চাণোদ-কর্ণালিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে পরমার্থ-তত্ত্বের চিন্তন করিতেছেন। একদিকে সন্ন্যাসী-পরমহংসদিগের সমাগমে, এবং অপর দিকে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলনে চাণোদ-কর্ণালি দক্ষিণাপথের কাশী বলিয়াও পরিগণিত। সং

পারে, এই বিবেচনা করিয়া সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিতে উৎসুক হইলাম। তন্নিমিত্ত চাণোদবাসী যোগদীক্ষিত সাধুদিগের মধ্যে, যিনি শাস্ত্রদর্শিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, তিনি যাহাতে আমাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দান করেন, তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিবার জন্য একটি পরিচিত দক্ষিণী পণ্ডিতকে সবিশেষ অনুনয় করিলাম। কিন্তু আমার বয়ঃক্রম নিতান্ত অল্প বলিয়া, সেই যোগদীক্ষিত সাধুটি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। আমি তাহাতে নিরাশ হইলাম না। এই ঘটনার কএক মাস পরে, দুইটি বিরক্ত পুরুষ দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া একটি জঙ্গলভূমি-মধ্যস্থিত ভগ্ন বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। আমি যে স্থলে থাকিতাম, সে স্থল হইতে সেই বাড়ীটি প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী ছিল। সেই বিরক্ত পুরুষ দুইটির মধ্যে একটি ব্রহ্মচারী এবং অপরটি সন্ন্যাসী ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণী পণ্ডিতটি নবাগত সাধুদ্বয়ের দর্শনাভিলাষী হইলেন, এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণী বন্ধুটি বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষরূপ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, সেই সাধুদুইটির প্রত্যেকেই এক একটি প্রগাঢ় পণ্ডিত। দক্ষিণাপথে শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত যে শৃঙ্গগিরির মঠ আছে, সাধুদ্বয় বলিলেন যে, তাঁহারা সেই মঠ হইতে আসিতেছেন, এবং দ্বারকায় গমন করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার নাম পূর্ণানন্দ সরস্বতী

ছিল, তাঁহাকে আমার হইয়া সবিশেষ উপরোধ করিবার জন্য দক্ষিণী পণ্ডিতটিকে বলিলাম। তদনুসারে তিনি আমার সম্পর্কে, পূর্ণানন্দকে বলিলেন যে,ইনি একটি যুবক—ব্রহ্মচারী, যাহাতে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া বেদান্তাদি শাস্ত্রের আলোচনা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে একান্ত ইচ্ছুক। ইহাঁর স্বভাব-চরিত্র যে যার পর নাই শুদ্ধ ও নির্ম্মল, সে পক্ষে আমি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। সন্ন্যাসাশ্রম অতীব কঠিন বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহা গ্রহণ করিবার পক্ষে, এই সকল কারণে ইহাঁকে যোগ্য বলিয়াই বিবেচনা করি। এইরূপ বলিয়া আমাকে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান করিবার জন্য পূর্ণানন্দকে অনুরোধ করিলেন। সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে ইনি যেমন সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, তেমনই ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনার পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারিবেন। দক্ষিণী বন্ধুটির উল্লিখিতরূপ অনুরোধবাক্যে অনুরুদ্ধ হইয়াও পূর্ণানন্দ প্রথমতঃ আপত্তি তুলিলেন। তিনি বলিলেন, দীক্ষার্থীর বয়স বেশী হয় নাই,—অধিকন্তু ইনি যখন গুজরাটী, তখন আমি মহারাষ্ট্রী হইয়া কিরূপে ইহাঁকে দীক্ষিত করিতে পারি? কোন গুজরাটী স্বামীর নিকটেই ইহাঁর দীক্ষা-গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা শুনিয়া দক্ষিণী বন্ধুটি বলিলেন যে, দক্ষিণী স্বামিগণ যখন গৌড়দিগকেও দীক্ষিত করিতে পারেন, তখন উপস্থিত দীক্ষার্থীকে তিনি দীক্ষাদান করিতে পারিবেন না কেন? কারণ উপস্থিত দীক্ষার্থী ত পঞ্চ দ্রাবিড়েরই

অন্তর্গত। * পূর্ণানন্দ তখন সম্মত হইলেন, এবং আমাকে তৃতীয় দিবসে দীক্ষিত করিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নাম প্রদান করিলেন। দীক্ষার পর গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া দণ্ডটি তাঁহাকে অর্পণ করিলাম। কেননা দণ্ডটি নিকটে থাকিলে, দণ্ড-সংসৃষ্ট কতকগুলি ক্রিয়াতে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানালোচনার পথে ব্যাঘাত ঘটিত।

অতঃপর সেই সাধুপুরুষ দুইটি দ্বারকার অভিমুখে গমন করিলেন। আমি চাণোদে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া ব্যাসাশ্রমে চলিয়া আসিলাম। কারণ ব্যাসাশ্রমে যোগানন্দ নামে এক জন যোগবিশারদ যোগীর কথা শুনিতে পাইলাম। তাঁহার

* ব্রাহ্মণাদি বর্ণগত, এবং এক এক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন প্রশাখাগত পার্থক্যগুলি ভারতবাসীর এরূপ প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে যে, যাঁহারা জ্ঞানে এবং ধর্ম্মে সর্ব্বোন্নত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতেছেন,—এমন কি যাঁহারা বর্ণাশ্রম-সীমার বাহিরে আসিয়া উদার উন্মুক্ত ও সর্ব্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক ভূমির উপরে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারাও অবস্থাবিশেষে বা অনুষ্ঠানবিশেষে উল্লিখিত পার্থক্যগুলির কোনটি না কোনটি মানিয়া চলেন! এই কারণ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকেও পঞ্চ-গৌড় ও পঞ্চ-দ্রাবিড়ের ভেদাভেদ মানিতে দেখা যায়। তন্নিমিত্ত কোন গৌড়-সন্ন্যাসী যেমন কোন দ্রাবিড়ী-দীক্ষার্থীকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতে চাহেন না, তেমনই কোন দ্রাবিড়ী-স্বামীও কোন গৌড়কে শিষ্য করিতে অগ্রসর হয়েন না। এ ত গেল শাখাগত প্রভেদ! সন্ন্যাসিগণ এ বিষয়ে প্রশাখাগত প্রভেদেরও অনুসরণ করেন। ইহার প্রমাণ উপরি-বর্ণিত ঘটনাটি। কেন না পূর্ণানন্দ আর দয়ানন্দ দুইজনেই পঞ্চ-দ্রাবিড়ের অন্তর্গত হইলেও, পূর্ণানন্দ মহারাষ্ট্রী ছিলেন বলিয়াই গুর্জ্জর দয়ানন্দকে দীক্ষিত করিতে কতই না ইতস্ততঃ করিলেন। যাঁহারা বিশ্বমিত্র হইয়া বিশ্বমঙ্গলের জন্যই জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দ্রাবিড়ীই বা কি? আর গুর্জ্জরই বা কি? সং

নিকট গিয়া যোগশিক্ষার্থী হইলাম। যোগানন্দের নিকটে যেমন যোগোপদেশ পাইতে লাগিলাম, তেমনই কতকগুলি যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার সমীপে যোগের প্রাথমিক শিক্ষা যখন সমাপ্ত হইল, আমি তখন ব্যাসাশ্রম হইতে ছিনুরে * আসিলাম। ছিনুর সহরের বাহিরে কৃষ্ণ শাস্ত্রী নামে একটি পণ্ডিত ছিলেন। আমি কিছু দিবস তাঁহার নিকট থাকিয়া ব্যাকরণ-শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিলাম। ছিনুর হইতে পুনর্ব্বার চাণোদে আসিলাম। সে বারে চাণোদে কিছু দীর্ঘ কাল রহিলাম। সেই সময়ে শিবানন্দ গিরি এবং জোয়ালানন্দ পুরী নামক দুইটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। এতদ্ভিন্ন তিন জনে একত্র হইয়া যোগবিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব সকলের আলোচনায় মাঝে মাঝে প্রবৃত্ত হইতাম। কিয়দ্দিবস পরে সাধু দুইটি চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহাদিগের নির্দ্দেশানুরূপ এক মাস পরে আহম্মদাবাদের সন্নিকট দুগ্ধেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। তথায় তাঁহাদিগের দুই জনের সঙ্গেই পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের সহিত সেই স্থলে মিলিলে, যোগবিদ্যার চরম রহস্য এবং চরম প্রণালীর বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দিবেন। বলা বাহুল্য

* ছিনুর ও ব্যাসাশ্রম প্রভৃতি স্থান চাণোদ হইতে দশ বার ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যেই। ছিনুরও নর্ম্মদা তীরেই অবস্থিত। ইহা একটি ক্ষুদ্র সহর। এখানেও বড়োদারাজের বৈভটদার, মুন্সেফ ও পুলিশ প্রভৃতি রহিয়াছে। সং

যে, তাঁহারা সেই স্থলে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। ফলতঃ যোগবিদ্যার যাহা কিছু ক্রিয়াগত শিক্ষা, তাহা উল্লিখিত সাধুদ্বয়ের নিকট হইতেই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ; এবং সে জন্য তাঁহাদিগের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিয়াছি। কিন্তু পরে যখন শুনিলাম যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল যোগীর সাক্ষাৎ বা সঙ্গলাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর শক্তি-সম্পন্ন এবং অধিকতর যোগবিদ্যানিপুণ যোগিগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের কেহ কেহ রাজপুতানার আবু পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন আমি অবিলম্বেই আবুতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আবুতে পৌঁছিয়া তথাকার পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ স্থানগুলি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, এবং পরিশেষে ভবানিগিরি নামক পবিত্র শৃঙ্গে কএকটি মহাত্মার সাক্ষাৎকার-লাভ পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের নিকটেও নানারূপ যোগক্রিয়া ও যোগপ্রণালী শিক্ষা করিলাম। আবু হইতে হরিদ্বারে আসিলাম। তখন ১৯১১ সম্বৎ।

হরিদ্বারে তখন কুম্ভমেলা। আমি হরিদ্বারেই সেই প্রথম কুম্ভ দেখিলাম। কুম্ভমেলায় যে এত ত্যাগী ও তত্ত্বদর্শী পুরুষের সমাগম হইতে পারে, তাহা কখন কল্পনাও করি নাই। কুম্ভের মেলা যত দিন রহিল, তত দিন আমি চণ্ডীর নিভৃত জঙ্গলে থাকিয়া যোগাভ্যাস করিলাম। তাহার পরে মেলাভূমি যখন যাত্রিশূন্য হইল, তখন হৃষীকেশে প্রায় একাকীই যোগানুশীলন করিতাম,—কদাচিৎ শুদ্ধচরিত্র যোগী-

সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়াও করিতাম। হৃষীকেশের নির্জ্জন প্রদেশে কিছু দিবস অতিবাহিত করার পর, একটি ব্রহ্মচারী ও দুইটি পাহাড়ী সাধু আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন। তখন আমরা তিন জনে একত্র হইয়া টেহিরিতে আসিলাম।

টেহিরি স্থানটি কেবল সাধু ও রাজপণ্ডিতে পূর্ণ দেখিলাম। এক জন রাজপণ্ডিত মাধ্যাহ্নিক ভোজনের নিমিত্ত এক দিবস নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার গৃহ হইতে একটি লোক আসিল। আমি পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া সেই প্রেরিত লোকের সহিত গমন করিলাম। কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই দেখিতে পাইলাম যে, এক জন ব্রাহ্মণ কতকগুলি মাংস লইয়া কাটিতেছেন। তাহার পর আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখি যে, কতকগুলি পণ্ডিত একটা মাংস-রাশির—ছিন্ন পশুর মাথা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি-সমন্বিত মাংসরাশির সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেও আমি তথায় থাকিতে পারিলাম না। পাছে সেখানে থাকিলে, তাঁহাদিগের সেই পবিত্র কার্য্য-সম্পাদনের ব্যাঘাত ঘটে, এই আশঙ্কায় একটি কথাও না বলিয়া গৃহস্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ব-স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। কএক মিনিট পরেই সেই মাংসভুক্ পণ্ডিতটি আসিয়া উপস্থিত। তিনি যে আমার ভোজনার্থই উল্লিখিতরূপ মাংসের আয়োজন করিয়াছেন, এই কথা বিনয়ের সহিত আমাকে বলিয়া

তাঁহার গৃহে পুনর্ব্বার যাইবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি তখন স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহাকে বলিলাম,—আপনারা আমিষভোজী, আর আমি এক জন কঠোর নিরামিষভোজী ; মাংসাহার ত দূরে থাক্—মাংস দেখিলেও আমার সাতিশয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। এরূপ স্থলে আমার আহারের নিমিত্ত মাংসের ব্যবস্থা করা সর্ব্বৈব বৃথা। আমাকে আহার করাইবার যদি একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছু ফলশস্যাদি পাঠাইয়া দিতে পারেন, আমি তাহা ব্রহ্মচারীর দ্বারা পাক করাইয়া এখানেই ভোজন করিতে পারি। ইহা শুনিয়া নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, এবং কিছু ফলশস্যাদি পাঠাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন।

টেহিরিতে কিছুকাল অবস্থিতির পর কিছু অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা হইল। পূর্ব্বোক্ত রাজপণ্ডিতটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তথায় কোন পুস্তকাদি পাওয়া যাইতে পারে কি না। তদুত্তরে পণ্ডিতটি বলিলেন,—সাহিত্য, ব্যাকরণ, কোষ, জ্যোতিষ এবং তন্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাইতে পারেন। তন্ত্র পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এই হেতু উহা আনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তদনুসারে পণ্ডিতটি কতকগুলি তন্ত্রের গ্রন্থ আনিয়া দিলেন। কিন্তু সেগুলি পড়িবামাত্র তাহাদিগের মধ্যে অশুদ্ধ শব্দ, অশুদ্ধ ব্যাখ্যা এবং নানা প্রকারের অসঙ্গতি-দোষ যেমন দেখিতে পাইলাম, তেমনই অভাবনীয় অশ্লীলতার সমাবেশ দেখিয়া চিত্তে ভীত হইয়া উঠিলাম। যখন দেখিলাম

যে, তন্ত্রের মধ্যে মাতৃগমন, কন্যাগমন, ভগিনিগমন, চণ্ডালিনিগমন, এবং চামারিণিগমন পর্য্যন্তও সমর্থিত হইয়াছে, সর্ব্বতোভাবে বিবস্ত্রীকৃত নারীর পূজার কথা রহিয়াছে, সর্ব্ববিধ জন্তুর মাংসাহার, মৎস্যাহার ও মদ্যপানাদি ক্রিয়াগুলিও পরিগৃহীত হইয়াছে,—এক কথায় পঞ্চ-মকার-সংসৃষ্ট সমস্ত পৈশাচিক অনুষ্ঠানগুলিই ব্রাহ্মণ হইতে লইয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই ব্যবস্থিত হইয়াছে; অধিকন্তু সেই পৈশাচিক অনুষ্ঠানগুলিকেই আবার মুক্তিপ্রাপ্তির উপায়রূপেও নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তখন যার পর নাই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। ফলতঃ তন্ত্রগুলির আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া উজ্জ্বলরূপেই ইহা বুঝিলাম যে, এই সমস্ত জঘন্য গ্রন্থ কতকগুলি ধূর্ত্ত ও দুষ্টবুদ্ধি লোকের দ্বারাই লিখিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র নামে প্রচারিত হইয়াছে। যাহা হউক আমি কিছুদিন পরে টেহিরি হইতে শ্রীনগরে চলিয়া আসিলাম।

কেদারঘাটের উপর একটি মন্দিরে অবস্থিতির জন্য বন্দোবস্ত করিলাম। তথাকার স্থানীয় পণ্ডিতদিগের সহিত যখনই কোন শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ হইত, আমি তখনই তন্ত্রের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতাম। কেদারঘাটে থাকিতে থাকিতে গঙ্গাগিরি নামক একটি সাধুর সহিত পরিচয় ঘটিল। গঙ্গাগিরি তাঁহার জঙ্গল-পরিবৃত শৈলাবাস হইতে দিবাভাগের মধ্যে কখনও বাহির হইতেন না। গঙ্গাগিরি সর্ব্বাংশেই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন বলিয়া, তাঁহার সহিত আমার পরিচয় শীঘ্রই

বন্ধুতার মূর্ত্তি ধারণ করিল। আমরা দুই জনে যখন একত্র হইতাম, তখন হয় যোগতত্ত্বের, না হয় অপর কোন পবিত্র তত্ত্বের আলোচনা করিতাম; এবং নিগূঢ় ভাবে বার্ত্তালাপ করিয়া পরস্পরে যেমন সুখী হইতাম, তেমনই আমাদিগের উভয়েই যে পরস্পরের যোগ্য, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতাম। গঙ্গাগিরির সংসর্গ এতই আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিল যে, আমি তাঁহার সহিত দুই মাসেরও অধিক কাল যাপন করিলাম। শরৎকাল উপস্থিত হইলে, সেই ব্রহ্মচারী ও পাহাড়ী সাধু দুইটিকে সঙ্গে লইয়া কেদারঘাট হইতে বাহির হইলাম। রুদ্রপ্রয়াগ প্রভৃতি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অগস্ত্য মুনির আশ্রমে আসিলাম। আরও একটু উত্তরে অগ্রসর হইয়া শিবপুরী নামক শৈলশৃঙ্গে শীত চারি মাস অতিবাহিত করিলাম। সেই স্থান হইতে সঙ্গী ব্রহ্মচারী ও সাধু দুইটি প্রস্থান করিলেন। আমি তখন পুনর্ব্বার কেদারঘাটের দিকে ফিরিলাম, এবং অবাধ-সংকল্প হইয়া একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে গুপ্তকাশীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তথায় কএক দিবস অবস্থিতির পর, গৌরীকুণ্ড ও ভীমগুফা হইয়া ত্রিযুগী-নারায়ণের মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলাম। সেখান হইতে কএক দিনের মধ্যেই কেদারে ফিরিলাম। কারণ কেদারঘাট আমার পক্ষে একটি প্রীতিস্থল হইয়া পড়িয়াছিল। উল্লিখিত সঙ্গী কএকটি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমি কেদারেই রহিলাম, এবং কেদারমন্দিরের পূজারি-পাণ্ডা প্রভৃতির সহিত মিলিয়া

মিশিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কেদারের পূজারিগণ জঙ্গম সম্প্রদায়ের লোক। সর্ব্বদা তাহাদিগের সংসর্গে থাকায়, জঙ্গমদিগের রীতিনীতি ও রহস্যাদি জানিবার পক্ষে সুবিধা হইল। আর সে পক্ষে আমার একটু প্রবল ইচ্ছাও ছিল। সুতরাং জঙ্গমদিগের বিষয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য কথাগুলি সহজেই জানিয়া লইলাম। তখন চতুর্দ্দিকস্থ চির-বরফাবৃত—কোথাও বা সঞ্চরণ-শীল বরফস্তর-পরিশোভিত পর্ব্বতমালা পরিভ্রমণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিলাম। কারণ নিজের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও, প্রায়ই শুনিতাম যে উল্লিখিত পর্ব্বতমালার স্থানে স্থানে মহাপুরুষগণ অবস্থিতি করিতেছেন। মহাপুরুষগণ ঐ সকল স্থলে সত্য সত্যই অবস্থিতি করেন কিনা? এই বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার জন্যই আমি চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতমালা অনুসন্ধান করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। কিন্তু নিদারুণ শীত এবং ভীষণ পার্ব্বতীয় পথের ভীষণ বিঘ্ন-বাধার কথা চিন্তা করিয়া, প্রথমতঃ পাহাড়ী লোকদিগকে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। পাহাড়ীদিগের যাহাকেই সাধুমহাত্মার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি, সেই আমাকে হয় ঘোর নির্ব্বোধ,—না হয় ঘোর ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে থাকে। এইরূপে কুড়ি দিবসকাল বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। পরিশেষে একা-কীই ঘুরিতে আরম্ভ করিলাম। কারণ আমার সঙ্গী ব্রহ্মচারী ও সাধু দুইটি দুই দিবসমাত্র থাকিয়াই দুরন্ত শীতাতিশয্য বশতঃ ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ফিরিবার সময়ে তুঙ্গনাথের শৃঙ্গে

আরোহণ করিলাম। তথাকার একটি মন্দিরে বহুসংখ্যক পুরোহিত এবং দেবমূর্ত্তি দেখিয়া, সেই দিবসেই নামিতে লাগিলাম। নামিবার সময়ে সম্মুখে দুইটি পথ দেখিলাম,—একটি পথ পশ্চিমদিকে, এবং অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। আমার পক্ষে কোন্ পথটি ধরা উচিত, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া জঙ্গলাভিমুখী পথটিই ধরিলাম। তাহার কিয়দ্দূর আসিয়াই একটি নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পড়িলাম। জঙ্গলটির কোথাও বন্ধুর-গাত্র বৃহৎ বৃহৎ পাষাণখণ্ড,—কোথাও বা বারিবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী। যাহা হউক স্বল্পদূর অগ্রসর হইয়া সেই জঙ্গল-পথটিও রুদ্ধ হইয়াছে দেখিলাম। তখন কোন দিকেই কোন পথ না পাইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে উচ্চে উঠি কি নীচে নামি? উচ্চে উঠিতে হইলে বিপুল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। হয়ত উঠিতে উঠিতে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং তখন নীচে নামাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম, এবং কতকগুলি তৃণগুল্মকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম। খানিক পরে একটি শুষ্ক নদীর উচ্চতর তটে আসিয়া উপনীত হইলাম। তাহার পর এক পাষাণখণ্ডের উপরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, চতুর্দ্দিকে কেবলই উচ্চ উচ্চ ভূমি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত, এবং মনুষ্যের অগম্য ও পথমাত্র-পরিশূন্য নিবিড় বনস্থলী। সে সময়ে দিবাকরও অস্তাচলের চূড়াবলম্বী হইতেছিলেন।

সুতরাং শীঘ্রই যে অন্ধকার আসিবে, এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে আমাকে এই জনশূন্য, অগ্নি-জ্বালিবার উপায়মাত্র-শূন্য ভীষণ বনভূমিতে যে একাকীই থাকিতে হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া চিত্তে একটু আন্দোলিত হইয়া উঠিলাম। সে অবস্থায় উৎকট পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন আর কোন উপায়ই ছিল না। এই হেতু যদিও সেই দুর্গম বনপথে আমার বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া গেল, শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইল, পাদতল কণ্টক-বিদ্ধ হওয়াতে খঞ্জের মত চলিতে হইল; তথাপি কেবল প্রবল পুরুষকারের প্রভাবেই আমি তাহা পার হইয়া আসিলাম। অবশেষে একটা পর্ব্বতের পাদমূলে উপনীত হইয়া একটা পথও দেখিতে পাইলাম। চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিলেও, আমি বিশেষরূপ না ভাবিয়া চিন্তিয়াই সেই পথটি ধরিলাম, এবং কিছুতেই তাহা না ছাড়িয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর আসিয়া কতকগুলি শ্রেণিবদ্ধ কুটীর দেখিতে পাইলাম। কুটীরবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করায়,তাহারা বলিল যে, সেই পথটি অখিমঠের দিকে গিয়াছে। সুতরাং আমিও অখিমঠের অভিমুখী হইলাম, এবং কিছুক্ষণ পরে তথায় যাইয়া পৌঁছিলাম।

রাত্রিটা অখিমঠে যাপন করিয়া পর দিন প্রাতে যখন উঠিলাম, তখন শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তথায় আর না থাকিয়া গুপ্তকাশীর দিকে যাত্রা করিলাম। গুপ্তকাশী হইতে উত্তরাভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। কিন্তু সে যাত্রা আমার নিকট প্রীতিকর বোধ না হওয়াতে, আমি

পুনর্ব্বার অখিমঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। অথচ বলিলাম যে, মঠ ও মঠবাসীদিগের রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়েই এখানে আবার উপস্থিত হইয়াছি।

অখিমঠটি যেমন প্রসিদ্ধ, তেমনই ধনসম্পত্তি-সম্পন্ন। মঠটি ধর্ম্মের ভাণে ও সাধুতার বিবিধ আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। আমি মঠে থাকিয়া সে সকল বিষয় পরিদর্শন করিবার সুবিধা পাইলাম। যাহাতে তাঁহার শিষ্য হইয়া সেখানে থাকি, অখিমঠের মোহন্তটি তদ্বিষয়ে আমাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাহা হইলে তাঁহার অবিদ্যমানে আমি যে তথাকার মোহন্ত-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ লক্ষ টাকার অধিপতি হইতে পারিব, এরূপ প্রলোভনও তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। মঠাধ্যক্ষের মুখে এবম্বিধ প্রস্তাব শুনিয়া আমি সরলভাবেই বলিলাম যে, যদি ধনসম্পদের প্রার্থী হইতাম, তাহা হইলে পিতার সংসার কখনই পরিত্যাগ করিয়া আসিতাম না। * কেন না, আমার পিতৃসম্পদ এই মঠের যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা কোন অংশেই কম বা কোন প্রকারেই স্বল্প লোভনীয় নহে। অধিকন্তু আমি যে লক্ষ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সংসারের সম্পদরাশি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আপনি সম্ভবতঃ সে লক্ষ্যসিদ্ধির নিমিত্ত কখন কোন প্রযত্ন করেন নাই,—সে লক্ষ্য-সাধনোপ-

* মূলে আছেঃ—"জাঁ মুঝে ধনকী চাহহোতী তো মঁ অপনে বাপ কী রিয়াসত ক্যোঁ ছোড়তা।" এতদ্দ্বারা বুঝা যায় দয়ানন্দের পিতার গ্রামাদি ভূ-সম্পত্তি,—অর্থাৎ তালুকদারি বা জমিন্দারি ছিল। সং

যোগী বিদ্যাও বোধ হয় আপনাতে নাই। ইহা শুনিয়া মোহন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন সে লক্ষ্য কি? আমি বলিলাম,—'যাহা ন্যায়, সত্য ও আত্মশুদ্ধির সাধন ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না, সেই মুক্তি—সেই যোগবিদ্যা বা সেই নিগূঢ় বিদ্যাই আমার লক্ষ্য। যত দিন সে লক্ষ্য সিদ্ধ না হইবে,—যত দিন আমাকে সাধনপথে থাকিতে হইবে; তত দিন অন্যান্য সাধনার সঙ্গে মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সাধিত করিয়া মনুষ্যমণ্ডলীকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের দিকে উন্নীত করিবারও চেষ্টা করিব। ইহা শুনিয়া মোহন্ত অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার সংসর্গে আরও কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথায় আমার প্রার্থিত বস্তু-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, আমি কিছু না বলিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলাম, এবং পর দিবস প্রত্যূষে অখিমঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জোশি মঠের অভিমুখে চলিয়া গেলাম।

জোশিমঠে * কতকগুলি দক্ষিণী শাস্ত্রী এবং সন্ন্যাসীদিগের সংসর্গে কিছুকাল থাকিলাম। সেখানে কতকগুলি যোগী এবং জ্ঞানাপন্ন সাধুকেও দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদিগের সহিত উপর্য্যুপরি বার্ত্তালাপে যোগবিদ্যা বিষয়েও কিছু নূতন তত্ত্ব পাইলাম, এবং তথা হইতে বদরিনারায়ণের মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। তথাকার প্রধান পুরোহিত রাওলজী একজন বিদ্বান্ ব্যক্তি।

* কেহ কেহ বলেন, জোশি মঠের প্রকৃত নাম জোতির্ম্মঠ। জোশিমঠ বা জ্যোতির্ম্মঠ শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত চারি মঠের ভিতর একটি। সং

বদরিনারায়ণের মন্দিরে কএক দিবস রহিলাম। রাওলজীর সঙ্গে বেদ ও দর্শন-শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হইল। নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন যথার্থ যোগী বা সিদ্ধপুরুষ অবস্থিতি করেন কি না? এই কথা রাওলজীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—না। ইহা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। তাহার পর রাওলজী যখন বলিলেন যে,তবে শুনিয়াছি তাঁহারা কখন কখন দর্শনার্থী হইয়া এই মন্দিরে আসিয়া থাকেন; তখন আমি সমীপবর্ত্তী স্থানগুলি—বিশেষতঃ শৈল-প্রদেশগুলি অনুসন্ধান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম।

এক দিবস সূর্য্যোদয় হইবামাত্র বদরিনারায়ণের মন্দির হইতে বাহির হইলাম, এবং পর্ব্বতমালার পাদদেশ ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। পরিশেষে অলকনন্দার তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অলকনন্দার অপর পারে বৃহৎ মানাগ্রাম দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু সে পারে যাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি পর্ব্বতমালার পাদদেশবর্ত্তী পথ ধরিয়া, এবং জঙ্গলাভিমুখী হইয়া অলকনন্দার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। কি পর্ব্বতমালা, কি পর্ব্বতমালার পাদ-প্রসারিত পথ সমস্তই ঘন বরফাচ্ছন্ন। এই হেতু অতীব কষ্টে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম পূর্ব্বক, যে স্থল অলকনন্দার উৎপত্তি-স্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই স্থলে গিয়া পৌঁছিলাম। তখন দেখি যে, আমার চতুর্দ্দিকেই গগণভেদী পর্ব্বতমালা দণ্ডায়মান। একে সে স্থান আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহার পর চারিদিকই পর্ব্বতমালায় পরি-

বেষ্টিত। সুতরাং কোন দিকেই পথের সন্ধান না পাইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে পথ ত নাই—এমন কি পথের চিহ্নমাত্রও নাই। এই হেতু কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত রহিয়া, অবশেষে নদীর অপর পারে যাইয়া পথের অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলাম।

আমার পরিধানে তখন সামান্য ও পাতলা কাপড় ছিল। কিন্তু সেখানকার শীত যেমন প্রবল, তেমনই অসহনীয়। এদিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণাতেও শরীর ক্লান্ত। ক্ষুধা শান্তির জন্য একখণ্ড বরফ গলায় দিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। কিছুক্ষণ পরে অলকনন্দা পার হইবার জন্য জলে নামিলাম। উহার জল কোন স্থানে খুব গভীর, কোন স্থলে বা অল্প। অল্প হইলেও কোন স্থলেই এক হাতের কম নহে। বিস্তারে অলকনন্দা আট দশ হাত হইবে। উহার তলদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্ন বরফখণ্ডে সমাকীর্ণ। সেই তীক্ষ্ণধার বরফখণ্ড-সমূহের সংঘর্ষণে আমার অনাবৃত পাদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। ক্ষতবিক্ষত স্থানগুলি হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইল। সেই রক্তস্রাবে যেমন অবসন্ন হইয়া পড়িলাম, নিদারুণ শীতেও তেমনই কতকটা হৃত-চেতন হইয়া গেলাম। সুতরাং পা টলমল্ করিতে লাগিল। কএক বারই সেই বরফমালার উপরে পড়িয়া যাইবার উপক্রম ঘটিল। তৎকালে এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, বুঝি বা অলকনন্দার সেই অসহনীয় শীতল গর্ভে পতিত হইয়া বরফে

জমাট বাঁধিয়া গিয়া জীবনটা হারাই। বস্তুতই আমার শরীর সে সময়ে যেরূপ অবসন্ন ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে অলকনন্দার সেই সুদূরবিস্তৃত বরফমালার উপরে যদি একবার পড়িতাম, তাহা হইলে আর গাত্রোত্থান করা আমার পক্ষে যার পর নাই কঠিন হইয়া উঠিত। যাহা হউক অতীব কষ্টে এবং উৎকট চেষ্টাতে নদীর অপর পারে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখনকার অবস্থা মৃতবৎ বলিলেই হয়। তাড়াতাড়ি করিয়া গায়ের কাপড়গুলি খুলিয়া ফেলিলাম, এবং তদ্দারা দুটি পায়ের পাদতল হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত অংশ দুইটি বাঁধিতে লাগিলাম। তখন আমি যেমন পরিশ্রান্ত, তেমনই ক্ষুধার্ত্ত, এবং তেমনই চলচ্ছক্তি-শূন্য। পরকীয় সাহায্যের আশায় সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। কিন্তু সে জনমানব-শূন্য স্থানে কে সাহায্য করিবে—সাহায্য কোথা হইতেই বা আসিবে? তাহার কিছুই জানি না। শেষ বার যখন চাহিলাম, তখন কিঞ্চিৎ দূরে দুইটি লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই পাহাড়ী লোক দুইটি আমার নিকটে আসিয়া নমস্কার করিল। তাহাদিগের বাড়ীতে যাইলে আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে তাহাদিগের বাড়ীতে যাইবার জন্য আহ্বান করিল। তাহারা আমার ক্লেশ-বিপদের কথা শুনিয়া আমাকে সদপত্ নামক পবিত্র স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু চলিবার সামর্থ্য না থাকায়, আমি তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইতে

পারিলাম না। তাহারা বারংবার অনুরোধ করিলেও আমি স্বীয় মতে সুদৃঢ় হইয়া রহিলাম। তাহাদিগের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া অবশেষে বলিলাম যে, এই স্থলে বরং মরিয়াও যাইব, তথাপি তাহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। মরিবার কথায় চিত্তে যেন একটু বিচলিত হইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম সে কি? মরিবার ইচ্ছা করিতে যাই কেন? জ্ঞানানুশীলনে রত থাকিয়া জীবনাতিপাত করাই কি আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য নহে? এদিকে দেখিতে দেখিতে সেই পাহাড়ী লোক দুইটি পর্ব্বতমালার মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিলাম, এবং বসুধারা নামক পবিত্র স্নান-তীর্থে স্বল্পক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ও মানাগ্রাম পার্শ্বে রাখিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে বদরিনারায়ণের মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাওলজী এবং তাঁহার সঙ্গিগণ আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক সমস্ত দিবার সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন দিবাসংঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলাম, এবং কিছু আহার পূর্ব্বক শরীরে একটু সুস্থ ও সবল হইয়া শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলাম। পর দিবস প্রাতে রাওলজীর নিকট বিদায় লইয়া রামপুরের অভিমুখে প্রস্থিত হইলাম।

সায়ংকালে একটি সাধুর আশ্রমে আগমন করিলাম। তিনি এক জন উচ্চ শ্রেণিস্থ সাধু বলিয়া পরিচিত। আমি তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্ম্মালাপ করিলাম, এবং স্বীয় সংকল্পে

দূরতর থাকিয়া পর দিবস প্রাতঃকালেই বাহির হইলাম। পথিমধ্যে বিস্তর পর্ব্বত ও জঙ্গল পার হইয়া, এবং চিল্কিয়াঘাট অতিক্রম করিয়া শেষে রামপুরে আসিয়া উপনীত হইলাম। রামপুরে পৌঁছিয়া রামগিরির আশ্রমে রহিলাম। রামগিরি, তদীয় সাধুতা এবং পবিত্রতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার একটি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। তিনি রাত্রিতে কখন নিদ্রিত হইতেন না। সমস্ত রাত্রি ঘরের মধ্যে একাকী থাকিয়া, কখন আপনাপনি কথাবার্ত্তা বলিতেন, কখন আর্ত্তনাদ করিতেন, কখন বা রোদন করিতেন। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শিষ্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। শিষ্যেরা তদ্বিষয়ে কিছুই বলিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন,—ইহা তাঁহার অভ্যাসমাত্র। রামগিরির সহিত আলাপাদি করার পর, সেই অদ্ভুত অভ্যাসের হেতু বিষয়ে কতকটা বুঝিতে পরিলাম। বুঝিলাম যে, ইহা প্রকৃত যোগক্রিয়া কিছুতেই নহে ; তবে ইনি যোগের দুই একটা ক্রিয়াও যে না জানেন,—এমতও নহে। যাহা হউক আমি কোন অংশেই এরূপ যোগের প্রার্থী নহি। অতঃপর রামগিরির নিকট বিদায় লইয়া কাশীপুরে আসিলাম। কাশীপুর হইতে দ্রোণসাগরে যাইয়া শীতঋতু অতিবাহিত করিলাম। দ্রোণসাগর হইতে মোরাদাবাদ অতিক্রম পূর্ব্বক সম্বলে পৌঁছিলাম। গড়মুক্তেশ্বর পার হইবার সময়ে দেখিলাম যে, পুনর্ব্বার গঙ্গাতটে উপনীত হইয়াছি।

এই সময়ে আমার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অপরাপর গ্রন্থ ব্যতীত হটপ্রদীপিকা, যোগবীজ ও শিবসন্ধ্যা প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক ছিল। আমি ভ্রমণকালে ঐ সকল পুস্তক প্রায়ই পাঠ করিতাম। উহাদিগের ভিতর কোন কোন গ্রন্থে নাড়ী-চক্রের বৃত্তান্ত দেখিতে পাইতাম। নাড়ীচক্র সম্পর্কীয় বিস্তৃত বিবরণগুলি পড়িতাম বটে, কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। তন্নিমিত্ত ঐ সকল গ্রন্থের শুদ্ধতা বা সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ হইত। সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টায় থাকিতাম, কিন্তু সে পক্ষে কোন সুযোগই ঘটিত না। একদিন দৈবক্রমে একটা শব গঙ্গাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিলাম। তাহা দেখিয়া, নাড়ীচক্র বিষয়ক সন্দেহ নিরাকৃত করিবার প্রকৃত সুযোগ উপস্থিত বিবেচনা করিয়া, সঙ্গের পুস্তকগুলি এক স্থানে রাখিলাম, এবং পরিধানের কাপড়গুলি খুলিয়া ফেলিয়া নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হইলাম। শবটাকে তীরে টানিয়া আনিয়া একখানা বড় ছুরী লইলাম, এবং যে সকল গ্রন্থে নাড়ীচক্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থ সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া খুব সাবধানতা পূর্ব্বক শবটির ব্যবচ্ছেদ-কার্য্য আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ হৃৎপিণ্ডটি বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলাম। তাহার পর নাভিদেশ হইতে পঞ্জর পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিলাম, মস্তক ও গ্রীবাভাগের কোন কোন অংশ চিরিয়া দেখিলাম,এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থোল্লিখিত বর্ণনাগুলিও মিলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম যে কিছুই মিলে না—ব্যবচ্ছিন্ন শবদেহের

কোন অংশে বা কোন অঙ্গেই যখন গ্রন্থ-বর্ণিত নাড়ীচক্রের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না, তখন সেই ব্যবচ্ছিন্ন শবটির সঙ্গে সেই গ্রন্থগুলিও ছিন্নভিন্ন করিয়া নদীপ্রবাহে নিক্ষেপ করিলাম। সেই সময় হইতে ক্রমশই বুঝিতে পারিলাম যে, বেদ, উপনিষদ্ এবং সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি ব্যতীত অপরাপর যোগ-গ্রন্থগুলির সমস্তই মিথ্যা। ইহার পর গঙ্গাতটে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া ফরাক্কাবাদে আসিলাম। ফরক্কাবাদ হইতে যখন শ্রীঞ্জীরাম অতিক্রম পূর্ব্বক ছাউনির পূর্ব্ববর্ত্তী পথ ধরিয়া কাণপুরে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন ১৯১২ সম্বৎ সমাপ্ত হইল।

অতঃপর পাঁচ মাস কাল কাণপুর ও এলাহাবাদের মধ্যবর্ত্তী নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলাম। ভাদ্রের প্রারম্ভে মৃজাপুরে পৌঁছিয়া বিন্ধ্যাচলের মন্দির-সমীপে প্রায় এক মাস কাল রহিলাম। আশ্বিন মাসে কাশীতে আসিয়া বরুণাসঙ্গমের সন্নিকট একটি গুহাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। সেই গুহাটি তখন ভূমানন্দ স্বামীর ছিল। কাশীতে রাজারাম শাস্ত্রী ও কাকারাম শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। সেখানে অধিক দিন রহিলাম না,—বার দিন মাত্র থাকিয়া স্বীয় প্রার্থিত বস্তুর উদ্দেশে পুনরায় বাহির হইলাম। চণ্ডালগড়ে ত্বুর্গাকোহার মন্দিরে আসিয়া দশ দিবস রহিলাম। এই সময়ে —কি দিবাভাগে কি রাত্রিতে প্রায়ই যোগাভ্যাস করিতাম। তন্নিমিত্ত অন্নাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দুগ্ধের উপরেই জীবনধারণ করিতেছিলাম। দুঃখের বিষয়, তখন আমার সিদ্ধি-

পানের অভ্যাস জন্মিয়াছিল। সিদ্ধিপান জনিত মাদকতায় সময়ে সময়ে বিভোর হইয়া রহিতাম। একদা উল্লিখিত মন্দির হইতে চণ্ডালগড়ের সন্নিকট একটি পল্লিতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় আমার একটি পূর্ব্বানুচরের সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল। রাত্রিযাপনের নিমিত্ত সেই পল্লির প্রান্তবর্ত্তী একটি শিবালয়ে আসিলাম। সিদ্ধির মাদকতাবশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাগত হইয়া একটি স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নটি এইরূপ ঃ— আমার বিবাহ সম্পর্কে মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর কথোপ-কথন চলিতেছে। পার্ব্বতী বলিতেছেন,—আমার বিবাহ করা উচিত। মহাদেব বলিতেছেন,—না। এইরূপ স্বপ্নে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া জাগিয়া উঠিলাম। তখন বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সুতরাং মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া ঢুকিলাম। বারান্দার সে অংশটি, মন্দির-প্রবেশের প্রধান দ্বারের ঠিক সম্মুখে। তথায় বৃষদেবতা নন্দীর একটি বৃহৎ মূর্ত্তি ছিল। সেই মূর্ত্তির উপর আমার বস্ত্রাদি রাখিয়া দিলাম, এবং তৎসমীপে বসিয়া ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হইলাম। খানিক পরে যখন একবার চাহিলাম, তখন অকস্মাৎ দেখিলাম যে সেই নন্দীমূর্ত্তির অভ্যন্তরে একটা মানুষ বসিয়া রহিয়াছে। তাহার দিকে হস্ত-প্রসারণ করিবামাত্র সে ভয়ে পলাইয়া গেল। আমি তখন সেই মূর্ত্তির অভ্যন্তরে গিয়া প্রবিষ্ট হইলাম, এবং তন্মধ্যেই অবশিষ্ট রাত্রি নিদ্রিত হইয়া রহিলাম। প্রাতঃকালে একটি বৃদ্ধা আসিয়া সেই বৃষ-দেবতার—অন্তঃপ্রবিষ্ট আমি-সম্বলিত বৃষদেবতার পূজা করিয়া

গেল। খানিক পরে সে দেবতার উপহারার্থ দধি ও গুড় প্রভৃতি উপকরণ লইয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা সম্ভবতঃ আমাকেই বৃষদেবতা বলিয়া মনে করিয়াছিল। তজ্জন্য সে আনীত উপকরণগুলি আমার সম্মুখেই স্থাপিত করিল। আমি কোন অংশেই সে-গুলির অসদ্ব্যবহার করিলাম না। ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম বলিয়া সে-গুলির সমস্তই উদরস্থ করিলাম। সিদ্ধির মাদকতা থাকায় দধি বড়ই মিস্ট বোধ হইল। দধির প্রভাবে সিদ্ধির মাদকতা যেমন চলিয়া গেল, শরীরও তেমনই সুস্থ হইয়া উঠিল। ইহার পর পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইলাম, এবং নর্ম্মদার উৎপত্তি-স্থান দেখিবার অভিপ্রায়ে অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণির অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পথের সংবাদ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ দিকেই চলিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে একটি জন-শূন্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সে স্থানটি ঘন জঙ্গলাবৃত, এবং তাহার এখানে সেখানে দুই একখানা পর্ণকুটীরও দৃষ্ট হইতেছিল। তথাকার একটা কুটীরে উপস্থিত হইয়া খানিকটা দুগ্ধ-পান করিলাম, এবং পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রায় আধ মাইল পথ অগ্রসর হওয়ার পরেই পথরোধ ঘটিল। কোন দিকেই পথের চিহ্ন নাই। তখন করি কি? নিতান্ত সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়াই চলিতে লাগিলাম। শীঘ্রই একটা ভয়াবহ জঙ্গলের ভিতরে আসিয়া পড়িলাম। জঙ্গলটা বন্য কুলগাছে, এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট ও বড় বড় তৃণদলে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে পথের

কোন নিদর্শনই দেখিতে পাইলাম না। সেই ভীষণ জঙ্গলভূমির উপরে দাঁড়াইয়া কি করিব ? কোথায় যাইব ভাবিতেছি, এমত সময়ে একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ভল্লুকটা বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং পশ্চাদ্দিকস্থ পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আমাকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে মুখব্যাদান করিল। আমি তখন স্পন্দহীন অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, এবং বেতের সরু ছড়িগাছটি ভল্লুকটির উপরে ধীরে ধীরে উঠাইতে লাগিলাম। তদ্দর্শনে—কি জানি কি কারণে, ভল্লুকটি ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এদিকে সেই বিকট ভল্লুকনাদ শুনিয়া উল্লিখিত কুটীরবাসিগণ সঙ্গে কুক্কুর, এবং হাতে লম্বা লম্বা লাঠি লইয়া আমার সাহায্যার্থ দৌড়িয়া আসিল। যাহাতে আর অগ্রসর না হই, এবং তাহাদিগের সঙ্গে ফিরিয়া যাই ; সে জন্য তাহারা আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে লাগিল। কেননা সেই জঙ্গল ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী ও মহিষাদি ভীষণ জন্তুসমূহের আবাসভূমি। সুতরাং, পাছে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে কোন নূতন বা গুরুতর বিপদে বিপন্ন হইয়া পড়ি, এই ভয়ে আমাকে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্য তাহারা বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি তখন তাহাদিগকে বলিলাম যে, আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমি সুরক্ষিত হইয়াই রহিয়াছি। আমি নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থল দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া যখন বাহির হইয়াছি, তখন বিপদের ভয়ে কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইব না। সুতরাং কুটীরবাসী

লোকেরা যখন দেখিল যে, তাহাদিগের অনুরোধ বা অনুনয় কোন অংশেই ফলপ্রদ হইল না, তখন আত্মরক্ষার জন্য আমার লাঠির অপেক্ষা একগাছা ভাল ও মোটা লাঠি, তাহারা আমার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল। আমি তখন তাহাদিগের লাঠিগাছটা লইলাম বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা ফেলিয়া দিলাম। ফলতঃ আমি কোন অংশেই ভীত বা ভগ্নোদ্যম না হইয়া অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলাম। বহুদূর পর্যান্ত কি গ্রাম, কি লোকনিবাস, কি একটা কুটীর, কি একটা মানুষ কিছুরই কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। পথের মাঝে মাঝে হস্তী কর্ত্তৃক ভগ্ন ও উৎপাটিত বৃক্ষসমূহ দেখা যাইতে লাগিল। তদ্দ্বারা সেই দুর্গম আরণ্য পথ আরও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে।

কিয়দ্দূর আসিয়া একটি অতি নিবিড় ও দুষ্প্রেবশ্য জঙ্গলের ভিতরে পড়িলাম। অসংখ্য কুলগাছে এবং অশেষবিধ কণ্টকাকীর্ণ গুল্মে সেই জঙ্গলভূমি সমাচ্ছন্ন। কোন দিক দিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। সুতরাং আমাকে মুক্ত করা তখন কঠিন হইয়া উঠিল। অগত্যা খানিক পথ বসিয়া বসিয়া, খানিক পথ হামাগুড়ি দিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এইরূপ চেষ্টার পরে যদিও আপনাকে সেই অভিনব বিপদ হইতে মুক্ত করিলাম বটে; কিন্তু তাহাতে আমার বস্ত্রগুলি যেমন ছিন্নভিন্ন হইল, বহুতর কণ্টকাঘাতে আমার শরীরের নানাস্থান হইতে তেমনই রক্তক্ষরণও হইতে লাগিল। সে সময়ে অন্ধকার উপস্থিত হইলেও আমি চলিতে ক্ষান্ত হইলাম না।

কিন্তু খানিক দূর আসিয়াই আবার পর্ব্বতশ্রেণিতে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলাম। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতের উপর ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতা দেখা যাইতে লাগিল। তাহার কোথাও কোথাও লোকনিবাসের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল। তথাকার কুটীরগুলির চারিদিকে রাশি রাশি গোময় রহিয়াছে, একটি নির্ম্মলবারি ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে ছাগলের দল চরিতেছে, এবং কুটীরগুলির কোন কোনটি হইতে অস্পষ্ট আলোকরেখা চক্‌মক্‌ করিয়া বাহির হইতেছে, এ সমস্তও ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতে লাগিল। সুতরাং উপস্থিত রাত্রি সেই স্থলে যাপন করিবার ইচ্ছা করিয়া, উল্লিখিত কুটীরগুলির নিকটস্থিত একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই তটিনীর জলে হাত-মুখ ধুইয়া, এবং রক্তাক্ত পাদদ্বয় পরিষ্কৃত করিয়া সন্ধ্যোপাসনায় বসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমত সময়ে ঢোলের শব্দ কর্ণগোচর করিলাম। স্বল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাইলাম যে, সেই পার্ব্বতীয় পল্লির স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা সকলে সমবেত হইয়া, এবং তাহাদিগের গবাদি পশুকে পশ্চাতে লইয়া, বোধ হয় কোন একটা নৈশ-ধর্ম্মোৎসবে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত যাত্রা করিতেছে। আমাকে একজন বিদেশী মনে করিয়া, তাহাদিগের সকলেই আমার চতুর্দ্দিকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগের জনৈক বৃদ্ধ আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা হইতে আসিতেছেন? আমি বলিলাম কাশী হইতে আসিতেছি, এবং নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থল দেখিবার জন্য যাইতেছি। ইহা শুনিয়া

তাহারা সকলেই চলিয়া গেল। আমি তখন সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই তাহাদিগের একজন নেতা, দুইটি পাহাড়ী লোক সমভিব্যাহারে আমার নিকটে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সেই লোকটা বোধ হয় তাহাদিগের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিল। আমার সন্ধ্যোপাসনা শেষ হইবামাত্র, সে ব্যক্তি আমাকে তাহাদিগের কুটীরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা মূর্ত্তিপূজক ছিল বলিয়া, আমি তাহার সে অনুরোধ রক্ষা করিলাম না। সে তখন আমার নিকটে বেশী পরিমাণে আগুণ জ্বালাইয়া রাখিবার আদেশ করিয়া এবং সমস্ত রাত্রি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেই পাহাড়ী লোক দুইটিকে নিয়োজিত রাখিয়া, আমাকে আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম যে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই খাই না। ইহা শুনিয়া সে আমার কমণ্ডলুটি চাহিল, এবং শীঘ্রই কমণ্ডলুটি ভরিয়া দুগ্ধ আনিল। আমি তাহার কিয়দংশ পান করিলাম। তখন আমার ভার সেই পাহাড়ী দুইজনের হস্তে অর্পিত করিয়া সে লোকটা চলিয়া গেল। রাত্রিটা গাঢ় নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে উঠিলাম, এবং সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপন পূর্ব্বক ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। *

---

* ইহার পর স্বামিজীর স্বরচিত জীবনবৃত্ত থিওসফিষ্টতে আর বাহির হয় নাই। এই প্রকাশিত অংশটি যে তাঁহার সমগ্র জীবনের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তাঁহার জীবনবৃত্তটি আর বাহির হইল না কেন? তিনি যখন থিওসফিষ্ট পত্রিকার জন্যই লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন পরবর্ত্তী অংশগুলি লিখিয়া যথাক্রমে

প্রকাশিত করিলেন না কেন ? এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর আমরা দিতে পারিব না। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, থিওসফিষ্টদিগের সহিত মতভেদ হওয়াতেই,—থিওসফিষ্টদিগের সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিহার করাতেই, স্বামিজী তাঁহাদিগের পত্রিকায় স্বীয় জীবনবৃত্ত আর প্রকাশিত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন নাই। ফলতঃ এই স্বরচিত জীবনবৃত্তটি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা যে স্বামিজীর অন্তরে এক কালে খুবই ছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচ হইয়া বলিতে পারি। সং *

---

* "In the same letter which contained the * * particulars, Swamiji says :—"Though I am very anxious that my autobiography which you are publishing in your journal, should be competed, I have not yet been able to give the necessary time to it. But as soon as possible I will send the narrative to you." The Theosophist 1880, April, p. 190.





